মূর্তপ্রশ্ন

মূর্ত্তপ্রশ্ন

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২

মূল্য—দুই টাকা

যাঁহার শঙ্খধ্বনিতে মকরবাহিনী গঙ্গা
আজ দুইকূল ডুবাইয়া আসিতেছেন
তাঁহার উদ্দেশ্যে নমস্কার।

মূর্ত্তপ্রশ্ন

১

অমূল্যর বি এ পাশের খবরটা বিদ্যুৎবেগে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। তাহার কারণ সমস্ত দিগ্‌গজপুরটার মধ্যে আজ পর্য্যন্ত যাহারা দুই একজন বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে তাহাদের সকলেরই জেলার হাইস্কুলের থার্ড ক্লাশ কি সেকেণ্ড ক্লাশ পর্য্যন্ত দৌড়। এদিকে অমূল্যর জ্যেষ্ঠতাত তারিণী চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অমরনাথের কথা বাদ দিলে বলিতে হয় যে বি এ পাশ করা দূরে থাক্ পিয়ারী সরকারের ফার্ষ্ট বুকএর "দি র‍্যাম, মানে, ঐ ভেড়া" করিয়াছে এমন একজনও চাটুর্জ্জে গোষ্ঠির মধ্যে অদ্যাবধি দেখা যায় নাই।

এই সকল কারণে ঐ মহৎ সংবাদটী গ্রামের মধ্যে এক বিশেষ চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি করিল।

পাড়ার ছোট ছোট বালক বালিকাগুলি অমূল্যকে একটা রহস্যময় বিভীষিকা বোধে তাহার নিকট হইতে 'শত হস্তেন বাজিনা'র পন্থার অনুসরণ করিল। গৃহস্থের কুলবধূগণ দীর্ঘ অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে সলজ্জ কৌতূহলদৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল; এবং সকলের উপর আশ্চর্য্য এই যে, যে সকল প্রবীণ, গ্রামভারী মোড়লগণ পূর্ব্বে তাহার প্রতি ভ্রমেও দৃষ্টিপাত করিতেন না, তাঁহারাই আজ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অমূল্যকে আপ্যায়িত করিতে আসিয়া বেচারাকে যৎপরোনাস্তি হতবুদ্ধি করিয়া দিলেন।

বৃদ্ধ চক্কোত্তিদা' আসিয়া বলিলেন—তাইতোরে অমূল্য, তুই এত বড়টা হয়েছিস্? আর চিনতে পারবারই জো নেই যে?

হঠাৎ সে এত বড়টাই বা হইল কোথা হইতে এবং চক্কোত্তিদাই বা আজ তাহাকে এতখানি কষ্টে চিনিতেছেন কেন তাহা সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়া অমূল্য সাশ্চর্য্যে বলিল—সেকি চক্কোত্তিদা? আমি ত প্রত্যেক মাসেই কল্‌কেতা থেকে বাড়ী আসি?

চক্কোত্তিদা' প্রমাদ গণিলেন। তথাপি নিজের অবস্থাটা সংশোধন করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে কহিলেন—আস্‌বিই তো। দেশের ছেলে দেশে আস্‌বিনি? তবে বলি কি, বুড়োর খোঁজ খবরটা তো আর নিস্ না, দেখ্‌ব কোত্থেকে? তা আমরা কি আর ভুল্‌তে পারিরে? এই দেখ্‌না, নিজেই এলুম। বলি, খোঁজটা নিয়েই আসি, ছেলেটা আছে কেমন।

প্রায় প্রতি সপ্তাহে ঘাটে পথে, মাঠে হাটে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় অথচ যিনি একটা মুখের কথাও কহেন না, তিনিই আজ আসিয়াছেন সংবাদ লইতে—কেমন আছে!

অমূল্য পরম আপ্যায়িত বোধ করিল।

তাহারপর চন্দরখুড়ো আসিয়াই স্বর ধরিলেন—আরে, আমি আগেই বলিছিলুম যে গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল করেতো ঐ হারাণদা'র ছেলে অমূল্যধন! কেমন? মিলেছে তো? আমরা আর ছেলে চিনিনে? তা বেশ হয়েছে; এখন বেঁচে থাকো বাপ্, আশীর্ব্বাদ কর্‌চি সুখে থাকো; আর আমাদের মাঝে মাঝে মনে রেখো, ইত্যাদি।

এইরূপে ভেলুমণ্ডল আসিয়া সাক্ষী দিলেন যে অমূল্যকে তিনি যখনই দেখিয়াছেন—শুধু বইয়ে আর মুখে। এমন কি তিনি তাহাকে আজীবন কখন স্নানাহার করিতেও নাকি দেখেন নাই।

নিতাইঠাকুর আসিয়া বহুক্ষণ গবেষণা করিয়া দেখাইলেন যে অমূল্যর ন্যায় ঐরূপ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ঐরূপ বড় মাথা, নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব আকার, ঐরূপ মাঝারি অথচ তূলিকা দ্বারা সামান্য যেন টানিয়া দেওয়ার মত চক্ষু হইলেই লোকে বিদ্বান্ হইয়া থাকে। তাহার প্রমাণ বিদ্যাসাগর হইতে আচার্য্য পি, সি, রায় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান।

সাক্ষাৎ ফলিত জ্যোতিষ!

অমূল্য গ্রামের লোকদিগকে বিলক্ষণ চিনিত। সেইজন্য আজ তাহাদের এই সকল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অত্যধিক খাতিরের মূলে কি যে গূঢ় উদ্দেশ্য লুক্কায়িত আছে তাহা সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়া বিশেষ শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিল।

ইহাদের চরিত্র স্মরণ করিতে গিয়া আজ তাহার গত জীবনের অনেক কথাই মনে পড়িয়া গেল।

সম্মুখের ঐ যে বড় বড় থামবিশিষ্ট প্রকাণ্ড পূজার দালানসংলগ্ন বৃহৎ অট্টালিকা, যাহাতে আজ তাহার জ্যেষ্ঠতাত তারিণী চাটুর্জ্জে পুত্রপরিবার লইয়া সুখে বাস করিতেছেন, একদিন তাহারাও ঐ বাটীর পরিবারভুক্ত ছিল। স্বপ্নের মত মনে পড়ে, উঠানে ঐ পেয়ারাগাছের

তলায় কতদিন সে কত খেলাই জ্যেষ্ঠতাতপুত্র ভোলানাথ, শঙ্কর মেসো'র কন্যা ইন্দু প্রভৃতি বাল্যের সঙ্গীদিগের সহিত খেলিয়াছে ; সন্ধ্যার সময় ছাতের উপর পিতামহীর ক্রোড়ে বসিয়া কত গল্পই না সে তাঁহার মুখে শুনিয়াছে ; বেশী পয়সা পাইবার লোভে স্নেহময় পিতামহের পাকা চুলের সহিত কত কাঁচা চুলই না সে ছিঁড়িয়া দিয়াছে ; পূজার সময় দালানে দুর্গাপ্রতিমা আসিলে স্নানাহার ভুলিয়া কতদিন সে পোটোর চিত্রাঙ্কন বসিয়া বসিয়া সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়াছে ; কালীপূজার সময় চাষী প্রজারা ঢোল বাজাইতে আসিলে উদ্ধব ঢুলিকে পিতামহের টিন হইতে কত তামাকই না সে চুরি করিয়া দিয়াছে ; এবং শেষরাত্রে বলিদান দেখিবে বলিয়া বসিয়া বসিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া কখন্ সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ও শেষে বাদ্যের শব্দে ধড়্ মড়্ করিয়া জাগিয়া উঠিয়া কত প্যাকাটীই না সে একসঙ্গে ধরাইয়াছে। এমনি কত কি সে করিয়াছে। এখনও ঐ পুরাতন বাটীর প্রত্যেক ইষ্টকখানির সহিত তাহার বাল্যের কতস্মৃতিই না জড়াইয়া আছে !

তাহারপর, অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে, তাঁহাদের বৃহৎ সংসারের মধ্যে কেমন যেন একটী অশান্তির আগুন ধুঁয়াইয়া উঠিতে লাগিল ; যেন পরিবারস্থ সকলের সদাহাস্যময় মুখে চিন্তার কালমেঘ ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। গ্রামের চক্কোত্তিদা' চন্দরখুড়ো, নিতাইঠাকুর প্রভৃতি সকলে একে একে পিতামহ ও পিতামহীর নিকট ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। তারিণী চাটুর্জ্জের সহিত ফিস্ ফিস্ করিয়া গোপনে তাহাদের কি সব পরামর্শ চলিতে লাগিল।

অবশেষে সেই ভীষণ দিন আসিল যেদিন মুখের উপর কি একটা উত্তর করিয়াছিলেন বলিয়া জ্যেষ্ঠতাত ক্রোধে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় অমূল্যর জননীর গর্ভে সজোরে পদাঘাত করিলেন ;

যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে করিতে তিনি ভূমিতে সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া পড়িয়া গেলেন ; তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রখানি শোণিতার্দ্র হইয়া গেল। বাটীময় ক্রন্দনের রোল উঠিল। গ্রামবাসীগণ অনেকেই ছুটিয়া আসিল। বৃদ্ধা পিতামহী পুত্রবধূকে ক্রোড়ের মধ্যে লইয়া তাহার মুখে জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। অমূল্যর পিতা উন্মাদের ন্যায় ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে করিতে চক্ষের জলে বুক ভাসাইলেন।

দীর্ঘকাল পরে জননীর জ্ঞানসঞ্চার হইলে পিতামহ উপবীত স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে ঐরূপ পাপের বাটীতে যদি আর তিনি জলগ্রহণ করেন তবে তিনি অব্রাহ্মণ।

সেই সময় প্রতিবেশীদিগের মুখের সেই চাপা হাসি অমূল্য যেন এখনও স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে।

সেই জ্বালাময় স্মৃতিবিজড়িত অশুভ দিবস হইতেই পিতৃপুরুষের ঐ বাস্তুভিটা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া তাহারা এই পর্ণকুটীরে আশ্রয় লইয়াছে ; এবং সেই দিন হইতেই জ্যেষ্ঠ্যতাত তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অমরনাথ ও কনিষ্ঠপুত্র ভোলানাথকে লইয়া সস্ত্রীক ঐ বৃহৎ অট্টালিকায় বসবাস করিয়া আসিতেছেন।

কয়েকবৎসরের মধ্যেই পিতামহ ও পিতামহী অন্তিমকালে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অভিশাপ দিতে দিতে পরলোক যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধাদি শেষ হইতে না হইতেই কি এক রহস্যময় উপায়ে যে পৈতৃক সম্পত্তিতে তাহার পিতার সকল অংশই জ্যেষ্ঠতাতের মুঠার মধ্যে চলিয়া গেল তাহা কেহই সম্যক্ বুঝিতে পারিল না।

কেবল তাহার নিরীহ, নির্ব্বিরোধী পিতা এইটুকুমাত্র উপলব্ধি করিলেন যে, যেমন করিয়াই হউক্, এমন কি মাথায় মোট বহন করিয়াও তাঁহার নিজের ক্ষুদ্রসংসারটী নিজেকেই চালাইতে হইবে। জ্যেষ্ঠের

পুঁজী ছিল ; সুদের কারবারেও বেশ দুইপয়সা উপার্জ্জন করিতেছিলেন। তাঁহার কোনও পুঁজী ছিল না ; তবে সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তাহার দ্বারাই অল্পবেতনে গ্রামস্থ বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের পদটী তিনি কোনক্রমে সংগ্রহ করিয়া লইলেন এবং অবসরকালে যাজনাদি করিয়াও যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সমস্ত ঘটনা আজ অমূল্যর মানসদৃষ্টির সম্মুখে চলচ্চিত্রের মত যেন একে একে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

২

তারিণীর জ্যেষ্ঠপুত্র অমর যখন জেলার হাইস্কুলের প্রত্যেক ক্লাসের পরীক্ষায় দুইতিনবার করিয়া টোক্কর খাইতেছিল অমূল্য তখন অমরের কনিষ্ঠ ভোলানাথকে নাড়ুগোপাল অবস্থায় রাখিয়া গ্রামের পাঠশালার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া গেল।

অমূল্য ভোলানাথেরই সমবয়সী। অতএব ভোলানাথের এই পরাজয়ে তারিণী চাটুর্জ্জের মন স্বভাবতঃই চঞ্চল হইয়া পড়িল। পাড়ায় কানাঘুষা চলিতে লাগিল নাকি অমূল্যকে তাহার পিতা হাইস্কুলে ভর্ত্তি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শুনিবামাত্র চক্কোত্তিদা, আসিয়া উপস্থিত।

তিনি কহিলেন—বলি হারাণ হে, তোমার কি মতিচ্ছন্ন ধরেছে বাপু। এইতো অন্তভক্ষ্যঃ ধনুর্গুণঃ অবস্থা। ছেলেটাও যাহোক্ আঙ্ক আঙ্ক দুটো শিখ্‌ল, এখন তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও, দুপয়সা উপায় করুক। তোমার ও আসান্ হোক—সংসারটাও স্বচ্ছল হোক্—

জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া হারাণ বলিলেন—সেকি চক্কোত্তি? অমূল্য তো এখনও বালক। সে কি উপায় করবে?

চক্কোত্তি বলিলেন—কেন উপায়ের ভাবনা কিহে। ঐ মুদীখানা দোকান্ টোকান্ দেখে ঢুকিয়ে দাও। দিব্য খাতাটা আস্‌টা লিখ্‌তে শিখুক! যাহোক্ নিজের পেট্‌টাও তো এখন চালিয়ে নিতে পারবে? তাইবা তোমার পক্ষে কম কি হে?

হারাণ বলিলেন—কি জান ভায়া, আমাদের দুঃখু তো এমনেও আছে অমনেও আছে। যদি ছেলেটা একটু মানুষ হয়, মন্দ কি?

—"নাঃ, মন্দ কি। তবে তোমার ভালও তো কিছু দেখ্‌তে পাইনে; আর তাও বলি—মানুষ করবার মালিক কি তুমি আমি হারাণ? ওসব কপাল থাকা চাই, বুঝলে?

শুনিয়া হারাণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কোনও উত্তর দিলেন না। বিশেষ সুবিধা হইবে না দেখিয়া "আমরা তোমার পর নই হে। কথাটা না হয় একবার তলিয়ে দেখো।" বলিতে বলিতে তিনি প্রস্থান করিলেন।

অমূল্য হাইস্কুলে ভর্ত্তি হইল! ইতিমধ্যে ভোলানাথ পাঠশালা ছাড়িয়া ছিপ্ হস্তে পরের পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরিয়া, প্রবচন অনুসারে সুখে কালাতিপাতের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। তাহার জ্যেষ্ঠ অমর শেষ পর্য্যন্ত হাল ছাড়ে নাই বটে; কিন্তু সেও অবশেষে একতাল সিদ্ধি গলাধঃকরণ করিয়া ললাটে দধির ফোঁটা পরিয়া পঞ্চমবারের বার স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিতে গিয়া যখন সবিস্ময়ে দেখিল যে অমূল্যও তাহার সমান হইয়া সেই পরীক্ষাই দিতে আসিয়াছে, তখন সিদ্ধির নেশা চটিয়া যাইবার আশঙ্কায় খাতাকলম গুটাইয়া তাড়াতাড়ি সে বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিল।

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে অম্‌রা? চলে এলি যে? এগ্‌জামিন্ দিলিনে?

উপযুক্ত পুত্র উত্তর দিলেন—তোমার কি বাবা ম'লেও একটু মান অপমান জ্ঞান হবে না? ঐ সব নাবালকের সঙ্গে এগ্‌জামিন্ দিতে গেলে লোকে আমার গায়ে থুতু দেবে না? তুমি বরং আমার একটা চাকরী জুটিয়ে দাও। দিব্যি আরামে থাকা যাবে'খন।

বলা বাহুল্য, ভগ্নহৃদয়ে পিতা তাঁহার পুত্ররত্নের জন্য অচিরেই কোন সওদাগরী আফিসে একটী কেরাণীর কর্ম্ম জোগাড় করিয়া দিলেন এবং ঐ সঙ্গেই এক নিরপরাধিনী—অনূঢ়া কন্যার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া একটী কন্যাদায়গ্রস্থ ব্রাহ্মণের জাতিকুল রক্ষা করিলেন।

এদিকে সারাগ্রামে সোরগোল পড়িয়া গেল, হারাণের ছেলে পাশ করিয়াছে এবং কলিকাতায় চলিয়াছে এন্‌ট্রান্স পড়িবার জন্য। তারিণীর মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

তিনি চন্দরখুড়োকে ডাকিয়া বলিলেন—হ্যাঁহে চন্দর! এ সব হচ্ছে কি? যতই হোক্ মা'র পেটের ভাই। আমি তো আর চুপ্ করে থাক্‌তে পারি নে। হারাণ যদি পথে বসে আমি কি তা সহ্য করতে পারব? তোমরা করছ কি?

চন্দর লাফাইয়া উঠিলেন—বটেই তো! আমি এখনি নিজে যাচ্ছি হারাণের কাছে।

যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ। দুইজনেই দুইজনের মনোভাব বুঝিলেন:। অথচ কেহ কাহাকেও ধরা ছোঁয়া দিলেন না।

চন্দর গিয়া হারাণকে কহিলেন—হারাণ কচ্ছ কি? নিজেও মরবে —ছেলেটাকেও মারবে?

শুনিয়া হারাণ 'ষাট্' 'ষাট্' করিয়া উঠিলেন; বলিলেন—কেন? কি হয়েছে চন্দর?

চন্দর ঝাঁঝাইয়া উঠিলেন—কি হয়েছে? বাপ্ হ'য়ে বিদেশে বিভুঁয়ে পাঠাচ্ছ কিনা এক দুধের বালককে? সাহসের বলিহারি বটে! অমূল্যকে ওই দুরন্তরে কি সহায় সম্বল দেখে পাঠাচ্ছ শুনি?

হারাণ বিষণ্ণস্বরে বলিলেন—সহায় সেখানে এক যজমানবাড়ী, আর সম্বলের মধ্যে লক্ষ্মীর চুপড়ির পাঁচটী টাকা। গরীবের আর কি আছে ভায়া?

ভাবগতিক সুবিধার নয় দেখিয়া ক্রোধে চন্দর 'মতিচ্ছন্ন—মতিচ্ছন্ন, বলিতে বলিতে প্রস্থান করিলেন।

অমূল্যও পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া যথাসময়ে কলিকাতায় রওনা হইল।

তাহারপর কলিকাতায় থাকিয়া, যথারীতি টিউসন করিয়া অমূল্য পড়াশুনা করিতে লাগিল। এণ্ট্রান্স পাশ করিলে তাহার জননী অন্নপূর্ণা সত্যনারায়ণের পূজা করিয়া সিরণী দিলেন। নিতাইঠাকুর সিরণী সেবন করিতে আসিয়া বহুপ্রকার জ্যোতিষবচন উদ্ধৃত করিয়া হারাণকে বুঝাইয়া গেলেন যে যাহা হইল ভালই হইল! অতঃপর অমূল্যকে আর পড়ানো বৃথা। কারণ গ্রহবিরূপ! বিদ্যাস্থানে এখন হইতে শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে।

লজ্জা ও সঙ্কোচ দূরে ঠেলিয়া তারিণী এবার নিজেই আসিয়া ভাদ্রবধূকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিয়া গেলেন যে—বৌমা, যা হবার হয়ে গেছে। সব কথা মনে রাখলে চলে না। হাজারই হোক্ আপনার জন তো! এখন অমূল্য যাহোক্ দুকলম শিখ্‌ল। যদি মত হয় তো বলে কয়ে কল্‌কেতায় কোনও ছাপাখানাটানা দেখে ছেলেটার যাতে একটা

কিনারা হয় তা করবার চেষ্টা দেখি। তোমাদের কষ্ট তো আর দেখ্‌তে পারিনে।

এতৎসত্ত্বেও অমূল্য যখন ফার্ষ্ট আর্টস্ পাশ করিল তারিণী তখন বোধ করি একরূপ প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়াই নিজের দুই বিঘা ধান জমি পর্য্যন্ত কবুল করিলেন; যদি ছেলেটা চাষবাসেও মন দেয়!

কিন্তু সকলের ওজর আপত্তি নামঞ্জুর করিয়া শেষে সত্যই একদিন অঘটন ঘটিয়া গেল। গ্রামে কখনও যাহা হয় নাই এক অমূল্য হইতেই তাহা হইল। সে বি, এ, পাশ করিল। পাশের সংবাদ সমস্ত দিগ্‌গজ্‌পুরে রাষ্ট্র হইলে সকলেই অমূল্যকে আপ্যায়িত করিতে আসিলেন। আসিলেন না শুধু তারিণী চাটুর্জ্জে। তিনি তখন মনের আগুনে মনে মনে দগ্ধ হইতেছিলেন ও একচক্ষু ভগবানকে অন্তরের যাতনায় শত সহস্র অভিসম্পাৎ করিতেছিলেন।

৩

হারাণ যখন প্রাতঃকালে হাটে যাইবার পরিবর্ত্তে দাওয়ার একটা খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া তাম্রকূট সেবন করিতে বসিলেন গৃহিণী অন্নপূর্ণা তখন প্রমাদ গণিয়া স্বামীকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁগো, এখন যে আবার হুঁকো নিয়ে বস্‌লে ?

চিন্তিতভাবে হারাণ বলিলেন—ভাবছি কি ছোট বৌ, হারু জেলে এইমাত্র একটা মিরগেল হাটে নিয়ে গেল। সে যে দশ আনার এক পয়সা কমে মাছটা ছাড়বে বলে তো মনে হয় না।

তিনি পুনরায় হুঁকাটা মুখে দিলেন।

শুনিয়া অন্নপূর্ণা স্বামীর এই অসময়ে তাম্রকূট সেবনের কারণটা বুঝিলেন; অমূল্য এখানে না থাকিলে কোনও দিন তাঁহাদের পুষ্করিণীর কল্‌মি শাক ও গাছের দুইটা কলা বেগুন, কোন দিন বা জুটিলে দুই চারি পয়সার তরকারিও বাজার হইতে আসে। এইরূপে তাঁহাদের দিন

গুজরান হইয়া থাকে। এবার অমূল্য বাটী আসা পর্য্যন্ত হারাণ প্রত্যহই হাটে যাইতেছেন; দুইচারি পয়সার স্থলে দুইচারি আনার বাজার আনিতেছেন। কিছু বলিলে বলেন—আহা, কোল্‌কেতায় ছেলেটা তো ইচ্ছেমত ভালমন্দ খেতে পায় না!

কোথা দিয়া কি হইতেছে অমূল্য তাহা সবিশেষ না জানিলেও অন্নপূর্ণা তো সকলই জানেন? গতকল্য পূর্ণিমাতিথিতে মণ্ডলদের বাড়ী সিরণী দিয়া হারাণ দশআনা পয়সা দক্ষিণা পাইয়াছেন। দশআনা তাঁহাদের নিকট দশ টাকার তুল্য। মৎস্যটির জন্য দরিদ্রের সম্বল ঐ দশআনাই খরচ করিয়া ফেলিতে হারাণের মনও সরিতেছিল না অথচ অমূল্যর কথা মনে করিয়া হারাণ ইচ্ছাটিকেও সম্পূর্ণ দমন করিতে পারিতেছিলেন না। স্বামীর মনোভাব বুঝিয়া অন্নপূর্ণা কোমলকণ্ঠে বলিলেন—তা অত ভাবনা কিসের? পয়সা তো রয়েছে?

হারাণ বিষণ্ণভাবে বলিয়া ফেলিলেন—সব পয়সাই যে খরচ হয়ে যাবে অন্নু?

অন্নপূর্ণার অন্তরতর প্রদেশে কে যেন নূতন করিয়া দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাত করিল।

তিনি বলিলেন—কি করবে বল? ওর কমে তো পাবে না? বসে বসে বেলা করে কি হবে? তাই আনোগে, যাও।

সাহস পাইয়া হারাণ বলিলেন—কি বল ছোট বৌ? বল্‌ছ যখন একান্ত, ও নিয়েই আসিগে মাছটা?

ছোট বৌ আর বলিবেন কি? শুনিয়া একটু হাসিলেন মাত্র।

হারাণ হুঁকাটা রাখিয়া গামছাখানা স্কন্ধে ফেলিয়া বলিলেন—আর দেখ অন্নু, এই তো পাশটাশের খবরও বেরিয়ে গেল। এখন অমূল্য কি

করতে চায় তা তো একবার জানা দরকার ?—একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ না, ওকি বলে ?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—আচ্ছা। হারাণ প্রস্থান করিলেন।

অমূল্যর কথায় স্নেহের গর্ব্বে অন্তর ভরিয়া উঠিলেও স্বামীর প্রস্থান পথের প্রতি চাহিয়া অন্নপূর্ণা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

খিড়কীর দরজা দিয়া অমূল্য বাটীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—মা।

পুত্রকে দেখিয়া জননী বলিলেন—এই যে এস্েছিস্ ? তোর কথাই এতক্ষণ হচ্ছিল।

অমূল্য সহাস্যে বলিল—আমার কথা পরে হলেও চলবে'খন মা। এখন ক্ষিধেয় পেটে যা পাক্ দিচ্ছে, কিছু খেতে না দিলে তো আর দাঁড়াতে পারি না।

অবিলম্বে অন্নপুর্ণা একটী বাটীতে করিয়া নিজহাতে ভাজা কিছু মুড়ি, একটু গুড় ও এক ঘটী জল দিয়া বলিলেন—

এই নে বাবা, বসে বসে খা'। কোথাও যাস্‌নে যেন। একটা কথা আছে। আমি ততক্ষণ কাপড়টা কেচে আসি।

মুড়ি চর্ব্বণ করিতে করিতে অমূল্য সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল।

একটী ঘড়া ও একখানি গামছা লইয়া অন্নপূর্ণা ঘাটে চলিয়া গেলেন।

৪

অন্নপূর্ণা প্রস্থান করিলে মাতৃদত্ত মুড়িগুলির যথোচিৎ সদ্ব্যবহার করিতে করিতে অমূল্য লক্ষ্য করিল, সম্মুখস্থ অঙ্গনের প্রান্তদেশস্থ অর্দ্ধভগ্ন সদর দরজার ফাঁক দিয়া বাহির হইতে কে যেন অতি সন্তর্পণে তাহাকেই দেখিতেছে। অমূল্য হাঁকিল—কেরে?

বাহির হইতে একটী ছোট মেয়ে ধরা পড়িয়া যাওয়ার লজ্জায় থতমত খাইয়া উত্তর করিল—আমি অমূল্য দা'।

পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া অমূল্য কহিল—ইন্দি বুঝি? বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

সত্যই এই কেন'র কোনও সহজ উত্তর ছিল না।

ইন্দুবালা তাহাদের প্রতিবাসী শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। বয়স ত্রয়োদশ বৎসর; কিন্তু দেখিলে মনে হয় দশ বৎসরের অধিক নয়। মাথায় একরাশ ঘন কুঞ্চিত কেশ; জীবনে কখনও সে তাহাদের

এতটুকুও যত্ন লয় নাই। গৌরবর্ণ ক্ষুদ্রললাটে ঘনকৃষ্ণ ভ্রূদুইটী যেন তূলিকার দ্বারা অঙ্কিত। টানা টানা চক্ষুদুইটীর দৃষ্টির সহিত ওষ্ঠাধরের গঠনের এমন একটী অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য আছে যে দেখিলেই মনে হয় সমগ্র জগতের উপর তাহার করুণা ও সহানুভূতি যেন শতধারে ঝরিয়া পড়িতেছে।

এক্ষণে অমূল্যর বয়স বিংশতি বৎসর হইলেও বাল্যাবধি বয়সের ব্যবধানকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া সে অমূল্যর সহিত ছায়ার মত থাকিয়া তাহার বহুবিধ হুকুমও তামিল করিয়াছে এবং বহুদিন আপন হস্তে খোলার কুচির উপাদেয় ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া সে অমূল্যকে পরম পরিতোষের সহিত ভোজনও করাইয়াছে; দুপুর রৌদ্রে কতদিন সে অমূল্যর সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া পেয়ারা পাড়িয়াছে, ফল্‌সা ছিঁড়িয়াছে, করমচা খাইয়াছে; সময়ে অসময়ে মতদ্বৈধ ঘটায় সে অমূল্যর সর্ব্বাঙ্গ কাম্‌ড়াইয়া আঁচ্‌ড়াইয়া ছিঁড়িয়া দিয়া আপনার পণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে এবং পরক্ষণেই বিপক্ষের পরাজয়ে দুঃখিত অন্তঃকরণে গৃহ হইতে সে চুরি করিয়া আচার আনিয়া তাহাকে ঘুষ দিয়াছে। কতদিন কত উদ্ভট আব্দারের অত্যাচারে যে সে অমূল্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে তাহার সাক্ষী তারিণী জ্যেঠার কনিষ্ঠ পুত্র ভোলানাথ এখনও বর্ত্তমান। পাঠার্থে অমূল্যর প্রথম কলিকাতা যাত্রার সময় ক্রন্দন ও চিৎকার করিয়া ইন্দু যে বিরাট সোরগোলের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখিবারই যোগ্য।

ইদানিং অমূল্যর অনুপস্থিতিতে ইন্দু তাহার জননী অন্নপূর্ণার গৃহস্থালীর অনেক কার্য্যেই সাধ্যমত সহায়তা করিয়া থাকে। কখনও কখনও সারাদিবস অন্নপূর্ণার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছায়ার মত ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে সন্ধ্যার সময় তাঁহারই ক্রোড়ে গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া

পড়ে; রাত্রে শঙ্কর অথবা ইন্দুর জননী আসিয়া ইন্দুকে বক্ষে করিয়া নিজগৃহে লইয়া যান। অমূল্যর কলিকাতায় বাসকালে ইন্দু হইতে অন্নপূর্ণা অমূল্যর অভাব অনেকখানিই ভুলিয়া থাকেন।

সেই ইন্দু আজ যে ভিতরে না আসিয়া কেন বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল তাহা সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়া অমূল্য বলিল—কৈরে? ভেতরে আয়না।

এইভাবে সনাক্ত হওয়ার পর আর ফিরিয়া যাওয়াও অসম্ভব। অগত্যা ধীরে ধীরে ইন্দু ভিতরে আসিয়া মুখ নত করিয়া দাঁড়াইল; মুখ নত করিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু তাহার দুষ্টামি মাখান চক্ষুদুটী দ্বারা মধ্যে মধ্যে অমূল্যকে দেখিয়া চাপা হাসি হাসিতে লাগিল। দেখিয়া অমূল্য কহিল—এ আবার কি ভাব?

ইন্দু উত্তর দিল না।

—'এই গ্যাখ., অমন করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?'

ইন্দু তবুও মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। অমূল্য কিন্তু এবার রীতিমত চটিয়া গেল; কহিল—দুষ্টমি রাখ্ ইন্দি। কি দরকার বল? বলিতে বলিতে কিন্তু ইন্দুর অঞ্চলাবৃত কোন রুচিকর দ্রব্যের উপর দৃষ্টি নিপতিত হওয়ায় নিজের দরকারটাই অমূল্যর বেশী বলিয়া বোধ হইল; সে বলিল—কিসের আচার রে? আন্‌ত দেখি।

হাস্যোজ্জ্বল মুখে ধীরে ধীরে ইন্দুবালা অমূল্যর নিকট গিয়া অঞ্চলের ভিতর হইতে আচারের বাটীটি বাহির করিয়া তাহার পার্শ্বে রাখিল। সাগ্রহে বাটীটি তুলিয়া অমূল্য বলিল—লেবুর আচার যে রে। একটু নুন্ আন্ তো।

এই আচারপ্রিয় মনুষ্যটীর সন্তোষবিধানের জন্য এমন অনেক দিনই ইন্দু জননীর ভাঁড়ার হইতে বহুপ্রকার আচার লুকাইয়া আনিয়াছে;

আজ ইহা নূতন নহে। এক্ষণে অমূল্যর অনুরোধে উৎসাহিত হইয়া লবণ আনিতে ইন্দু অন্নপূর্ণার ভাঁড়ারে প্রবেশ করিল।

এমন সময় জলপূর্ণ কলস কক্ষে লইয়া অন্নপূর্ণা গৃহে প্রবেশ করিলেন। সুযোগ বুঝিয়া চিরঅভ্যাসমত ইন্দুকে লইয়া ঈষৎ রঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে অমূল্য উচ্চকণ্ঠে বলিল—ঐ দেখ মা, ইন্দির আক্কেল্ দেখ!

অন্নপূর্ণা বলিলেন—ইন্দু এসেছে? কৈ? কোথায় সে?

বলিয়া তিনি ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিলেন। ভাঁড়ারের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া সহাস্যে অমূল্য ইন্দুকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিল—কি জানি মা কি নিচ্ছে। না দেখে তো আর মিছামিছি বদ্‌নাম দিতে পারি না।

অমূল্যর আচরণে ইন্দু মহা চটিয়া গেল; অন্নপূর্ণা ভাঁড়ারের দিকে কৌতূহলদৃষ্টি ফিরাইতেই সে লবণহস্তে বাহিরে আসিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ছোট্ট ছোট্ট হাতদুইখানি তুলিয়া বলিল—এই দেখ না মাসী, আমি তোমাদের কি নিয়েছি!

অমূল্যর নিকট আচারের বাটী; ইন্দুর হস্তে লবণ; অন্নপূর্ণা সমস্ত ব্যাপারটী সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতে দরদমাখান স্বরে বলিলেন—এ কিন্তু অমূল্যর ভারি অন্যায়। নুনও নেবে, গুণও গাইবেনা, এমন দুষ্ট তো আমি ভূভারতে দেখিনি মা!

পরে ইন্দুবালার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন—তা, মা, এনেছ যখন, না হয় ওটুকু ওকে দাও। আমি ততক্ষণ কাপড়টা ছেড়ে আসি।

বামহস্তে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে ইন্দু হস্তের সামগ্রীটি অমূল্যর কাছে রাখিয়া, রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। অমূল্যর অনুতাপমিশ্রিত সহস্র আহ্বানেও আর ফিরিয়া চাহিল না। অগত্যা সে আচার লইয়া বসিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা এতক্ষণে একখানি শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া উনানে অগ্নি সংযোগ করিয়াছেন। অমূল্য বলিল—আমাকে কি বল্‌বে বল্‌ছিলে না মা?

তিনি বলিলেন—উনি জিজ্ঞেস্ কর্‌ছিলেন, এবার তুই কি কর্‌বি ঠিক কর্‌লি?

পাশ করিবার খবর বাহির হওয়া পর্য্যন্ত অমূল্যও ঐ চিন্তাই করিতেছে—কি করিবে?

তিন তিনটা পাশ করিয়াছে বলিয়া গ্রামের লোকে তাহাকে যত বড় বলিয়াই মনে করুক না কেন বা তাহার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল কল্পনা করিয়া যতই হিংসাপূর্ণ কটাক্ষ করুক্ না কেন, সে তো দেখিতেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তিনটি বহিঃসৌন্দর্য্যবিশিষ্ট রঙ্গিন্ ছাপ্ লইতে গিয়া তাহার জীবনের কতখানি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে! শুধু পড়িবার মোহে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার উত্তেজনায় সংসারের দৈনন্দিন অত্যাবশ্যকীয় কঠোর প্রশ্নগুলাকে সে এতদিন ভবিষ্যতের মসীময় অন্তরালে ঠেলিয়া রাখিয়া একরূপ সব ভুলিয়াই ছিল; ভাবিত—পাশ করিলে একটা যা হয় কিছু হইবে।

কিন্তু পাশ করিয়াই সে দেখিল ঐ 'যা হয় কিছু' শব্দটা এতই অনির্দ্দিষ্ট ও এতই ব্যাপক যে বাস্তব জগতে তাহার নাগাল পাওয়া একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়।

কলিকাতায় সে দেখিয়া আসিয়াছে, একটি পঁচিশটাকা মাসিক বেতনের কর্ম্মের জন্য বহু গণ্যমান্য-ব্যক্তি-লিখিত প্রশংসা-পত্ররূপ-বর্ম্মাবৃত গ্রাজুয়েটদিগের রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। পথে ঘাটে, স্কোয়ারে বাজারে, বায়স্কোপে থিয়েটারে, গ্রাজুয়েটদিগের হুড়াহুড়ি। ইহার উপর আবার, ইদানিং কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার কোনও মূল্য

আছে বলিয়াও তাহার আর মনে হয় না; বিশেষতঃ পদপ্রার্থী যদি একজন হিন্দু বা বাঙ্গালী যুবক হয়।

অথচ যাহার পেটে বোমা বিস্ফোরণ করিলেও মুখ হইতে বর্ণপরিচয় প্রথমভাগের আত্মক্ষরটিও নিঃসরণ হয় না এমন একজন মাড়ওয়ার প্রত্যাগত ব্যক্তি, মাত্র 'লোটাকম্বল' সম্বল করিয়া এই কলিকাতার বক্ষের উপরই শুধু ব্যবসায় দ্বারা দুইচারি বৎসরের মধ্যেই রাজপ্রাসাদ তুল্য গগনস্পর্শী সৌধনির্ম্মান করিয়া ফেলে; ইহাও সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে এবং ভাবিয়াছে—আমরা এমন কেন? উহাদের কি আছে এবং আমরাই বা কি হারাইয়াছি যাহার জন্য বাঙ্গালায় আজ বাঙ্গালীর অন্ন নাই, আপনার গৃহে আপনার স্থান নাই? এ কোন্ দেবযানীর অভিশাপে আজ আমাদের এই বহুকষ্টার্জ্জিত বিদ্যার্জ্জনও নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে?

ইহা কি আমাদের বহুযুগব্যাপী অবাস্তবের উপাসনার প্রায়শ্চিত্ত, না অবশ্যম্ভাবী জাতিগত ধ্বংশের পূর্ব্বাভাষ?

অমূল্য করিবে কি?

জীবনে তো অনেক কিছুই করিতে বাসনা হয়, কিন্তু করিতে কি পারা যায়? এত দেখিয়াও অমূল্যর কেমন ইচ্ছা হয় সে এম, এ পড়িবে, ল'পরীক্ষা দিবে, পি আর এস্ হইবে, ডি লিট্, ডিএল্ হইবে, বিলাত যাইবে—আরও কত কি? কিন্তু ইহা কি সম্ভব? অর্থ কোথায়?

শুনা যায় হরিনাথ দে বা রাসবিহারী ঘোষের মত মাথা থাকিলে জলপানির সাহায্যে সামান্য অর্থে সকল সাধই তাহার মিটিতে পারে। কিন্তু মেধা ত তাহার অনন্য সাধারণ নহেই, নেহাইৎ রামা শ্যামার মত।

অমূল্যর আবার শুধু পড়িলেই তো চলিবে না! যে পিতা শত সহস্র

বাধাবিপত্তি মাথায় করিয়া একরূপ শরীরের শোণিত দিয়াই তাহাকে এতদিন মানুষ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও আজ সে মানুষ হইয়াছে কিনা বলিতে পারে না, তথাপি এইটুকু তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে তাহার জন্য সর্ব্বত্যাগী পিতা আজ বৃদ্ধবয়সেও কঠোর দারিদ্র্যের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। অতএব শুধু টিউসান করিয়া পড়িয়া গেলেই চলিবে না, আরও কিছু করিতে হইবে।

পারিবে কি ?

এইতো গেজেট বাহির হইবার পর হইতেই সে খবরের কাগজের 'কর্ম্মখালি'র স্তম্ভ দেখিয়া সকল স্থানেই ক্রমাগত দরখাস্ত করিয়া আসিতেছে।

হাতের লেখা তাহার পাকিয়া উঠিল কিন্তু একটী ফলও তো তাহার ভাগ্যে বৃন্তচ্যুত হইল না ?

বহুচিন্তা করিয়া সে এখন স্থির করিয়াছে যে, কোনও আফিসে দৈবাৎ কোন কর্ম্ম জুটিয়া যায়, উত্তম। এমন কি কলেজ খুলিবার পূর্ব্বে কোন বিদ্যালয়ে যদি শিক্ষকরূপেও নিযুক্ত হইতে পারে তাহাহইলেও সে বি-এল পড়িবার আশা ত্যাগ করিবে না। বি-এল পড়িয়া কি হইবে তাহাও সে জানে। বেশ্যা আর উকীল যে একই প্রকার ব্যবসায়ের অন্তর্গত জীব তাহাও তাহার অবিদিত নাই ; তথাপি মহামায়ার মায়ায় জীব আবদ্ধ ! বিশ্ববিদ্যালয়ের মায়া বা মোহও যে সে সহসা কাটাইয়া উঠিতে পারিবে সে ভরসা তাহার নাই। বলিতে কি, মাষ্টারী করিয়া প্রাইভেটে এম-এ দিবার বাসনাও সে মনে মনে পোষণ করিয়া রাখিয়াছে।

ইহা ব্যতীত করিবার যে অন্য কি আছে তাহাও সে বুঝিতে পারে না। তবে দৈববিড়ম্বনায় যদি তাহার সকল সঙ্কল্পই ব্যর্থ হয় তবে সে

কিছুদিনের নিমিত্ত কলিকাতায় যাত্রা করিবে। তাহারপর ভগবান আছেন—আর সে আছে!

অন্নপূর্ণা এতক্ষণ ফুটন্ত জলে চাউলগুলি নিক্ষেপ করিয়া তরকারি কুটিতে বসিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ কোনও উত্তর না পাইয়া তিনি বলিলেন—চুপ্ করে রইলি যে অমূল্য?

অমূল্য ভাবিল—বিপদ! এত কথা জননীকে কি করিয়া বুঝাই? সকল কথা খুলিয়া বলিতে গেলে সেই নিজেদের দুঃখ, কষ্ট, অভাবের কথাই আসিয়া পড়িবে; পুত্রকে যে মানুষ করিয়া তুলিবার অবস্থা তাঁহাদের নাই ইহা ভাবিতে স্নেহান্ধ জননী নিশ্চয়ই ব্যথা পাইবেন; আপনারা যে কতখানি সহায়সম্বলশূন্য সেইটাই তাঁহার হৃদয়ে বেশী করিয়া আঘাত করিবে।

সাত পাঁচ ভাবিয়া অমূল্য বলিল—ল'কলেজ খুলতে আর হপ্তাদুই দেরী আছে। এই ক'টা দিন দেখে যা হয় একটা ঠিক করবো'খন।

অতঃপর এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দিবার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি সে বলিল—এখন আজ কি রান্না হচ্ছে বল দেখি মা? তোমার মুড়িগুলো তো এরি মধ্যে হজম হয়ে এল বলে মনে হচ্ছে।

এমন সময় একটী প্রকাণ্ড মিরগেল-স্কন্ধে হারাণ বাটীতে প্রবেশ করিয়া উল্লাসসূচকস্বরে হাঁকিলেন—ছোট বৌ!

৫

অন্নপূর্ণা ব্যস্তসমস্ত হইয়া 'এইযে এসেছ' বলিয়া রন্ধনশালা হইতে বাহিরে আসিলেন। হারাণ মৎস্যটীকে উঠানে ফেলিয়া বলিলেন—হারুটার আজকাল ভারী তেজ্ হয়েছে। এত বল্‌লুম তবু দুটো পয়সা ছাড়লে না! যাক্, মাছটা বড় আছে, কি বল ছোট বৌ?

অন্নপূর্ণা মস্তকআন্দোলন দ্বারা জানাইলেন যে এ বিষয়ে তাঁহার মতদ্বৈধ নাই।

হারাণ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—অমূল্য, কলকেতায় এটার দাম কত হবে বল্‌তো?

অমূল্য দেখিল মৎস্যটী প্রায় আড়াইসের; সে বলিল—তা,আড়াই কি তিন টাকাও হতে পারে।

হারাণ বিজয়ী বীরের ন্যায় হাস্যমুখে অন্নপূর্ণার দিকে চাহিলেন; যেন বলিতে চাহেন—দেখ্‌লে ছোট বৌ, কি জেতাটাই জিতেছি?

অন্নপূর্ণা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—বলিস্ কি? তি—ন টা—কা?

অমূল্য বলিল—তা হবে বৈকি।

হারাণ কহিলেন—যাক্। কুটে ফেল মাছটা, বেলাও হয়েছে। হ্যাঁ দেখ, দুচারখানা অমনি শাঙ্খ্যদের ওখানে পাঠিয়ে দিও ছোটবৌ। মাছটা ত কম বড় নয়! আমরা তো খেতে মোটে তিনটী প্রাণী। অমূল্য তুই ততক্ষণ ইন্দুকে ডেকে আন্ না কেন? সে আজ এখানেই খাবে'খন। আর বলছিলুম কি ছোট বৌ—

হঠাৎ থামিয়া গিয়া হারাণ কেমন 'কিন্তু' 'কিন্তু' করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর মুখুর্জ্জেকে স্নেহ করিয়া হারাণ 'শাঙ্খ্য' বলিয়া ডাকিতেন।

হারাণের ভাব লক্ষ্য করিয়া অন্নপূর্ণা কহিলেন—কি? বলনা?

হারাণ কহিলেন—নাঃ, এমন কিছু নয়। তবে বল্ছিলুম কি, এত বড় মাছটাই যখন এসে পড়ল—

কথাটা বলিতে তাঁহার বাধ বাধ ঠেকিল।

অন্ন। আর কাউকে দেবে বলছ কি?

হা। হ্যাঁ—তা দেখ, অনেক্কেই তো দিতে ইচ্ছে হয় ছোটবৌ, কিন্তু ভগবান তো আমাদের সেদিন দেন্ নি!

অন্ন। তবে?

কাশিয়া গলাটা ঈষৎ পরিষ্কার করিয়া লইয়া হারাণ বলিলেন—এই বল্ছিলুম কি, অমনি দুচারখানা দাদাদের ওখানে পাঠালে হয় না? আজ শনিবার, অম্‌রাটাও বাড়ি আস্‌বে।

অমরনাথ কলিকাতায় থাকিয়া চাকুরী করিত ও প্রতি শনিবার বাটী আসিত।

অন্নপূর্ণা ভগবানের বিচিত্র সৃষ্টি দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন। এক

বৃন্তের দুইটী পুষ্পের ন্যায়, একই গর্ভের দুই সন্তান। কিন্তু কি অদ্ভুত পার্থক্য! একজন দিতে চাহেন প্রাণভরা অকপট স্নেহ; আর একজন চাহেন তাহার প্রতিদানে দিতে লাঞ্ছনাপূর্ণ প্রত্যাখ্যান। আজ নূতন করিয়া যে তাঁহার স্বামী ভাসুরদের বাটীতে দুইখানি মৎস্যের টুকরা পাঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তাহা নহে; যখনই যাহা কিছু গৃহে আনিয়াছেন তাহা হইতে কিছু না কিছু অগ্রে তিনি জ্যেষ্ঠকেই পাঠাইয়াছেন।

আপন সহোদরকে হারাণও যে চিনিতেন না তাহা নহে; বিলক্ষণই চিনিতেন। এবং সেইজন্যই এরূপস্থলে অন্নপূর্ণার নিকট কোন কিছু বলিতে তিঁনি মধ্যে মধ্যে অতখানি লজ্জিত হইয়া পড়িতেন।

অন্নপূর্ণা সহজকণ্ঠেই বলিলেন—তা বেশ তো। ইন্দুকে দিয়েই পাঠিয়ে দোব'খন। কৈ অমূল্য যা রে, ডেকে আন্ তাকে?

অমূল্য এতক্ষণ পিতার কথা শুনিতেছিল এবং গর্ব্বে তাহার বুকখানা দশ হাত হইয়া উঠিতেছিল; এমন পিতার পুত্র সে! মৎস্যটির মূল্য কিছুই নয়; কিন্তু তাহার পিতার অন্তঃকরণ যে কতখানি উচ্চ, উদার তাহা চিন্তা করিতেও অমূল্য পুলকিত হইয়া উঠিল। সে বলিল—এই যে যাচ্ছি—মা!

অমূল্য প্রস্থান করিলে হারাণ বলিলেন—কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলে অন্নু?

অন্যের অসাক্ষাতে অন্নপূর্ণাকে তিনি 'ছোটবৌ' এর পরিবর্ত্তে অন্নু বলিয়াই সাদরসম্ভাষণ করিতেন।

অন্নপূর্ণা কহিলেন—হঁা।

—কি বল্লে?

—বল্লে, হপ্তা দুই পরে যা হয় একটা ঠিক করে ফেল্বে।

অমূল্যর কিছু ঠিক করিয়া ফেলা'র সহিত তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থার যে একটী সূক্ষ্ম যোগসূত্র বর্ত্তমান তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া বিমর্ষভাবে হারাণ বলিলেন—বেশ। উপযুক্ত হয়েছে তো। আমাদের আর বলবারই বা কি আছে!

পরে গামছাখানা স্কন্ধে ফেলিয়া বলিলেন— যাই, ছিদেমটার ওখান থেকে একটু তেল মাথায় দিয়ে স্নানটা সেরে আসি।

'ছিদেম' অর্থে গ্রামের মুদী শ্রীদাম ঘোষ।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্নপূর্ণা মৎস্যটী কুটিতে বসিলেন।

৬

পিতার আদেশে ও জননীর অনুরোধে অমূল্য শঙ্কর মুখুর্জ্জের বাটীতে প্রবেশ করিয়া, সম্মুখে কাহাকেও না দেখিয়া অবশেষে ডাকিল—ইন্দু।

ইন্দু গৃহের মধ্যেই ছিল। অমূল্যর আহ্বান যে শুনিতে পাইল না তাহা নহে। তাহার স্বর সে যথেষ্টই চিনিত; চিনিত বলিয়াই কোনও উত্তর দিল না।

সে ভাবিল, কি নির্ল্লজ্জ এই অমূল্যদা! আজই সকালে তাহাকে একরূপ চোর বলিয়া ধরাইয়া দিয়া আবার আসিয়াছে ডাকিতে। সে কিছুতেই জবাব দিবে না।

ইন্দু অতিরিক্ত মনযোগসহকারে পুতুলের ছোট ছোট রঙিন্ কাপড়গুলি গুছাইতে লাগিল।

কাহারও কোনও উত্তর না পাইয়া অমূল্য পুনরায় স্বর একটু উচ্চ করিল—ও—ইন্দি!

রন্ধনগৃহের মধ্য হইতে ইন্দুর জননী বলিলেন—হ্যাঁরে ইন্দি, শুন্‌তে পাচ্ছিস্ না? দেখনা একবার কে ডাকৃছে? ইন্দু ঝাঁঝাইয়া উঠিল—তুমি দেখনা!

এমন সময় বাটীর দাসী গয়লা-বৌ গৃহপালিত গাভীগুলির আহার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া ফিরিল। অমূল্যকে তদবস্থায় দণ্ডায়মান দেখিয়া সে বলিল—ওমা, দাদাবাবু যে! তা দাঁড়িয়ে কেন? দাঁড়াও আসনখানা দি।

অবিলম্বে দাবায় একখানি আসন পাতিয়া দিয়া গয়লাবৌ বলিল—বোস দাদাবাবু বোস। আমি মাঠান্‌কে ডেকেদি'; বলিয়া সে রন্ধন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

অমূল্যর নাম শুনিয়া ইন্দুর জননী অনতিবিলম্বে ছুটিয়া আসিলেন। এবার ইহাদের বাটীতে অমূল্য সত্যই বহুদিন পরে এই প্রথম আসিল। আসন হইতে উঠিয়া সে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া ইন্দুর জননী বলিলেন—এস বাবা এস।

পরে আনন্দের আতিশয্যে ডাকিলেন—ওরে ইন্দু দেখে যা কে এসেছে। ইতিপূর্ব্বেই যে ইন্দুর সহিত অমূল্যর সাক্ষাৎ হইয়া গিয়াছে তাহা তিনি জানিতেন না।

অমূল্য বলিল—ইন্দু আছে নাকি মাসী? তবে সাড়া দেয় না কেন?

ইন্দুর জননী বলিলেন—সাড়া দেবে কি বাবা। খালি খেলা-গেলা আর খেলা!

বলিয়া তিঁনি অমূল্যর নিকটে উপবেশন করিয়া বলিলেন—হ্যাঁ বাবা, এতদিন পরে কি মাসীকে মনে পড়্‌ল?

অমূল্য সত্যই ঈষৎ লজ্জিত হইল। কলিকাতা হইতে পাশের সংবাদ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই তাহার ইঁহাদের বাটীতে একবার আসা উচিৎ ছিল। তাই সে কোন উত্তর দিতে পারিল না।

সহসা অমূল্যর বর্ত্তমান মূল্যের কথা স্মরণ হওয়ায় ইন্দুর জননী বলিলেন—তা বাবা, তোমার দোষ কি? এখন তো তোমায় আর যখন তখন আস্‌তে বল্‌তে পারিনি! তুমি এখন কত কাজে ব্যস্ত!

বোধ হয় তাঁহার ধারনা যে, সে যখন অতগুলা পাশ করিল তখন নিশ্চয়ই সে এখন হইতে তাঁহাদের বোধাতীত বহুজটীলকর্ম্মে দিবারাত্র ব্যস্ত থাকিতে বাধ্য।

অমূল্য কিন্তু এক্ষণে নিজে যে কি কর্ম্মে ব্যস্ত তাহা বুঝিতে না পারিয়া বরং আপনার ত্রুটিতে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া সরল সত্যই স্বীকার করিল—এখন আর আমার কি কাজ মাসী? কেন আস্‌তে পারব না?

ইন্দুর জননী আধুনিকভাবে শিক্ষিতা হন নাই। সাদাসিধা, সরল 'সেকেলে' গ্রাম্যবধূ যাহাকে বলে তিঁনি তাহাই। অতএব তিঁনি মনে করিলেন ইহা অমূল্যর বিনয় বা সৌজন্যমাত্র।

তজ্জন্য বলিলেন—তা বাবা তুমি এমনি ছেলেই বটে। উনিও তোমার কত সুখ্যাতি করেন, বলেন অমন ছেলে লাখে একটা দেখা যায় না। অত বিদ্বান্ হয়েও একটু দেমাক্ নেই।

'উনি' অর্থে—তাঁহার স্বামী শঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

অমূল্য গ্রামের সকলের প্রশংসা সহ্য করিয়াছে। সহ্য করিয়াছে, যেহেতু তাহারা সহজ স্নেহ বা ভালবাসার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই তাহাকে প্রশংসা করে নাই। তাহাদের উচ্চপ্রশংসার মূলে স্বার্থ, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ কখন কখন টিট্‌কারিও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কোন কোন স্থলে যে সে তাহাদের চাটুবাদ উপভোগ করে নাই তাহাও নহে। কিন্তু এই সাদাসিধা স্নেহের মাসীটির নিকট সে যে আজ অতখানি বৃহৎ হইয়া উঠিবে এবং বড় হওয়ার শাস্তিস্বরূপ তাহার আবাল্যপরিচিত স্নেহাঞ্চল

হইতে সম্মানের ব্যবধান লইয়া দূরে সরিয়া যাইবে, ইহা চিন্তা করিতেও তাহার কষ্ট বোধ হইল।

অমূল্য অবিলম্বেঃ "আঃ কি বল্‌ছ মাসী?" বলিয়া ইন্দুর জননীর প্রশংসার স্রোত বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল—আসল কথাটা কি জান? হটাৎ অনেক দিনের বাঁধন খোলা পেয়ে এই ক'দিন আর আপনার লোকদের কথা মনেই ছিল না। তুমি শুধু পাঁচজনের মত আমাকে খাতির করে দূরে ঠেলে দিচ্ছ বইতো না?

কথার শেষটায় অভিমানের আভাষ পাইয়া ইন্দুর জননী বলিয়া উঠিলেন—সে কি বাবা? আমি কি তোমায় দূরে রাখ্‌তে পারি? ওকথা মুখে আন্‌তে আছে?

ক্ষুণ্ণস্বরে অমূল্য বলিল—তা নয়তো কি? আমি এমন কি হয়েছি যে আমায় তোমরা জোর করে এত বড় করে তুল্‌ছো?

তাহার এই অমায়িক ব্যবহারে সমস্ত কষ্টাজ্জিত সঙ্কোচ দূর করিয়া দিয়া স্নেহবিগলিতকণ্ঠে ইন্দুর জননী বলিলেন—না বাবা, তুমি আমার যে অমূল্য সেই অমূল্যই আছ।

তাহাকে পূর্ব্বঅভ্যাসমত অমূল্য 'বলিয়া' ডাকিতে অমূল্য যেন অনেকখানি সুস্থ বোধ করিল। পরে কৃত্রিমকোপপ্রকাশপূর্ব্বক কহিল—এই বলে রাখ্‌লুম মাসী, ফের যদি তুমি আমায় বিদ্যাদিগ্‌গজের সিংহাসনে বসিয়ে কথা আরম্ভ করো তাহলে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধাবো। বলিয়া সে নিজেই হাসিয়া ফেলিল। শুনিয়া তিঁনিও হাস্য করিতে লাগিলেন।

ইন্দু ভিতর হইতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আশা করিতেছিল যে অমূল্য আসিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহার সহিত একটা আপোষে মিটমাট করিয়া লইবে। ও—হারি! সে সকল কিছু না করিয়া সে কিনা দিব্য, আসনে বসিয়া,

গল্প স্বরু করিয়া দিল ? আবার এমন গল্প যে সহজে শেষ হইতেই চাহে না ! ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। আচ্ছা ! পূর্ব্বে সে তো কখনও এমন করে নাই। ইন্দুর শত দোষ থাকিলেও সেই আসিয়া সাধিয়া কথা কহিয়াছে ! ভারি তো ! পাশ অমন কত লোকে করে। দুবছরের মধ্যে পাশ করিয়া এত কি হইল যে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিবারও দরকার হয় না ?

দেখিতে দেখিতে সযত্নরক্ষিত পুতুলের কাপড়জামাগুলা সে একপাশে ছুড়িয়া ফেলিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

আবার হাসিতেছে ? নাঃ। থাকৃতো তারিণী জ্যেঠার ছেলে ভোলা ! তা হ'লে সেও তার সঙ্গে অমনি হাসিয়া গল্প করিত; আর দেখ্‌তো তখন এসে সেধে কথা কহিত কি না !

ইন্দু আর বসিয়া থাকিতেও পারিল না। উঠিল। কক্ষের বাহির হইল। উঠানে নামিয়া অমূল্যর প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া হেলিয়া দুলিয়া সদর দরজার অভিমুখে অগ্রসর হইল। যেন দেখাইতে চাহে, যে সে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, বা কাহারও মুখসন্দর্শন করিবার তাহার আদৌ স্পৃহা নাই।

ইন্দুবালাকে দেখিয়া অমূল্য বলিল—ঐ যাঃ মাসী, আসল কথাটাই ভুলে গিয়েছিলুম। ইন্দু আজ আমাদের ওখানেই খাবে। বাবা তো তাই আমায় পাঠালেন।

ইন্দুর জননী বলিলেন—তা ঐ তো যাচ্ছে; ও ইন্দু, তোর অমূল্যদা'র সঙ্গে যা।

ইন্দু যেন কিছুই শুনিতে পায় নাই এইরূপভাবে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল।

অমূল্য বলিল—আজ তা তাহলে চল্লুম্ মাসী, ইন্দুকে ঐখান থেকেই ধরে নিয়ে যাই।

ইন্দুর জননী বলিলেন—এস বাবা। যে ক'টা দিন আছ এক আধবার এসো।

ইন্দু দরজার বাহিরে পা দিল।

ইন্দুর জননীর নিকট বিদায় লইয়া অমূল্য বাহিরে আসিয়া ইন্দুকে গ্রেপ্তার করিল। ইন্দু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া কহিল—আঃ, ছেড়ে দাও। আমি যাবনা।

অমূল্য সাশ্চর্য্যে কহিল—কেন রে? কি হোল তোর?

মুখভার করিয়া ইন্দু বলিল—কি হবে আবার?

—তবে যাবিনি কেন?

—ইচ্ছে।

সহাস্যে অমূল্য কহিল—এতখানি সদিচ্ছা হবার কারণ?

ইন্দু কোনও উত্তর দিল না। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া অমূল্য কহিল—চল্, যাওয়া যাক্?

—না।

অমূল্য গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া কহিল—ইন্দুবালা, অতখানি স্ত্রীস্বাধীনতা তো এখনও দিগ্‌গজপুরে প্রবেশ করেছে বলে জানা যায় নি?

কথাটা সম্যক্ বোধগম্য হইল না। ইন্দু চুপ করিয়া রহিল।

অমূল্য ডাকিল—আয়।

—না

—আবার না কেন?

ইন্দু আর থাকিতে পারিল না; সে বলিয়া উঠিল—আমি তো পরের বাড়ী চুরি কর্ত্তে যাই না।

অমূল্যর এতক্ষণে পূর্ব্বোক্ত লবণের ইতিবৃত্তান্ত মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু ইন্দু বালিকা হইলেও তাহার এইরূপ উত্তরে ঈষৎ আহত হইয়া অমূল্য গম্ভীর স্বরে ডাকিল—ইন্দি!

ইন্দু কহিল—কি।

—আমাদের বাড়ি বুঝি পরের বাড়ি?

অমূল্যর স্বর শুনিয়া ইন্দু বুঝিল, একটা অন্যায় হইয়া গিয়াছে। অতএব সে চুপ্ করিয়া রহিল।

অমূল্য বলিল—কথা বলিস্ না যে?

—কি বল্‌ব?

—আমাদের পর মনে করিস্?

ইন্দুর চক্ষে জল আসিল। কহিল—না।

অমূল্য বলিল—তবে আয়।

—না।

অমূল্য ইন্দুর হাতখানি ধরিল। যাইতে একান্ত অনিচ্ছা দেখাইবার জন্য সে পথের উপর বসিয়া পড়িল। অমূল্য তাহাকে আকর্ষণ করিল। ইন্দু উঠিল না।

অমূল্য বলিল—আয় দেরী হচ্ছে—

ইন্দু উঠিল না।

'আচ্ছা মেয়ে যাহোক্' বলিয়া অমূল্য সহসা তাহাকে সজোরে দুইহস্তে তুলিয়া লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। ইন্দুও দিব্য চলিল। কাঁদিল না। হাত পা ছুঁড়িল না। পূর্ব্বের মত অমূল্যকে আঁচড়াইল না, কামড়াইল না; দিব্য চলিল।

৭

তারিণী চাটুর্জ্জে দেখিলেন, শুধু বসিয়া বসিয়া ভগবানকে অভিসম্পাৎ দিলে ভগবানের তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় কি না তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না; বরং নিজের ইহাতে বিশেষ লোকসানের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে; মাত্র হা হুতাশই সার হয়।

তারিণী পাকা লোক। আলস্যে কালহরণ না করিয়া তিঁনি তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে নিজের এবং ভগবানের সহিত একটী রফা করিয়া লইলেন। ভাবিলেন, ঈশ্বরের অপরাধ কি? তিঁনি আবশ্যকমত তাঁহাকে সমস্তই দিয়াছেন। হস্তপদাদি হইতে বল বুদ্ধি, মায় সহকারীস্বরূপ চন্দর, নিতাই প্রভৃতিকেও তিঁনি তাঁহারই কৃপাতেই লাভ করিয়াছেন। সকলই প্রস্তুত। শুধু পরিশ্রমের যা অপেক্ষা।

উর্ব্বর জমী আছে, উৎকৃষ্ট বীজ আছে, সহজ প্রাপ্য অপর্য্যাপ্ত জলও নিকটে বর্ত্তমান। কিন্তু চেষ্টা কই? ফসল ফলিবে কোথা হইতে?

তারিণী বড় লজ্জিত হইলেন। ছি! ছি! এতদিন কি না তিনি অযথা পরমকারুণিক পরমেশ্বরকেই সকল দোষে দোষী করিতেছিলেন?

সহসা তিঁনি এই ঐশ্বরিক দানের সদ্ব্যবহার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন এবং চন্দর খুড়ো তাঁহার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতেই 'ওহে—শুনেছ' বলিয়া উপযুক্ত পরিশ্রম ও বুদ্ধির দ্বারা ক্ষেত্রে ফসল ফলাইবার প্রয়াস পাইলেন।

নূতন কিছু মজার সংবাদের আশা করিয়া চন্দর অনুসন্ধিৎসু নয়নে তারিণীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তারিণী ঈষৎ ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে বলিলেন—আজকাল হারাণের বাড়িতে খুব সমারোহ চল্‌ছে যে চন্দর!

চন্দর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি রকম?

তারিণী বলিলেন—আর কি রকম। ইয়া বড় বড় রুই কাৎলা আস্‌ছে, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রন্ধন হচ্ছে, শঙ্কর টঙ্করকেও নেমন্তন্ন চল্‌ছে, বাদ যাচ্ছি শুধু তুমি আর আমি!

বলিয়াই যেন একটা মিথ্যাকথার পাপ হইতে অবিলম্বে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইবার অভিপ্রায়েই বলিয়া ফেলিলেন—তবে আমি যে একেবারে বাদ্ পড়েছি, তা ঠিক বল্‌তে পারিনে।

চন্দর বিস্ফারিত লোচনে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন? তোমাকেও নিমন্ত্রণ করেছে নাকি?

চন্দরের প্রশ্নে তারিণী অবাক্ হইলেন।

—আমাকে নিমন্ত্রণ করবে হারাণ? কি যে বল চন্দর তা'র ঠিক নেই। তুমি যে দেখি, দিন দিন ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছ?

ইহা শুনিয়া সেই পঞ্চাশৎবর্ষীয় ছেলেমানুষটী তাঁহার লোমবহুল

বিরাট উদরদেশ হইতে এক একটী করিয়া পক্ককেশ উৎপাটন করিতে করিতে বলিলেন—তবে যে বাদ পড়োনি বল্‌ছিলে?

শুনিয়া তারিণী তো আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারেন না। হা হা করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রথমে দুইটী অঙ্গুলি প্রদর্শন করিলেন। তাহারপর হাসির ফাঁকে ফাঁকে অতি কষ্টে এক একটী কথা বলিয়া এইভাবে বাক্যসমাপ্ত করিলেন যে—দু'খানা—চন্দর—দু'খানা। গোনা দু'খানা মাছের টুক্‌রো। নেহাইৎ তোমাদের ভয়ে, সোহাগ জানিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তা'ও বাবু নিজে আস্‌তে পারেন্‌নি। শঙ্করার মেয়েটার হাত দিয়ে পাঠান হয়েছে!

চন্দর আকাশ হইতে পড়িলেন। এঁ্যা! এ হইল কি? হারাণেরা খাইতে পায় না, একথা শুনিতে মন্দ লাগে না। তাহাদের পরিধানের বস্ত্র নাই, এ অতি দিব্য সংবাদ। আজ যদি শুনা যায়, ঋণের দায়ে তাহাদের ঐ গোলপাতার গৃহটুকু নীলামের ডাকে ও পেয়াদার জুলুমে বিকাইয়া যাইতেছে তাহা হইলে তাঁহারা অবিলম্বে যাইয়া হাহুতাশ করিয়া সহানুভূতি দেখাইয়া আসিতেও প্রস্তুত আছেন। তাহা নহে। বরং সকলই বিপরীত হইতে চলিল? পূজারী বামুনের ছেলে তিন চারিটা পাশ করিল, বাটীতে রুই কাৎলা আমদানি হইতে সুরু হইল; ইহা তো সুবিধার কথা নহে!

শ্লেষসূচকস্বরে চন্দর বলিলেন—অমন না দিলেই তো হোত? প্রত্যুত্তরস্বরূপ তারিণী একটু হাসিলেন। এ হাসিতে তাঁহার মুখশ্রীর যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইল তাহাতে বরং তাঁহার প্রাণ খুলিয়া কাঁদিলেই ভাল ছিল।

চন্দর চুপ্‌ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ঈষৎ নিম্নস্বরে কহিলেন—আচ্ছা তারিণী, এসব হচ্ছে কোথেকে? শুনে তো আস্‌ছি, এদিকে কানাকড়িরও সম্বল নেই?

মুখ বিকৃত করিয়া তারিণী বলিলেন—ঐ শুনেই নিশ্চিন্ত থাক। চন্দর যেন একটী মহাতথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন—

তবে কি হারাণের ভেতর ভেতর কোন রোজগার আছে নাকি?

'আছে বৈকি! তবে—হারাণের নয়!' বলিয়া তারিণী কোনও বিশেষ অর্থে চন্দরএর প্রতি এক কটাক্ষ হানিলেন।

চন্দর যেন কিছুই বুঝেন নাই অথচ সমস্যাটীর সমাধান ও করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না এইভাবে বলিলেন—কৈ? অমূল্যকেও তো এখনও তেমন কিছু উপায় কর্‌তে শুনিনে?

তারিণী কথাটীকে যেদিকে লইয়া যাইতে চাহেন চন্দরের ন্যায় ধড়িবাজ লোক বহুপূর্ব্বেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই উত্তরগুলি ঠিক রাস্তায় রাখিয়া নিজে একটী নিরীহ ভালমানুষ সাজিতেছিলেন মাত্র।

যাহাদের মনোভাব এবং উদ্দেশ্য অভিন্ন তাহাদেরই মধ্যে এই লুকোচুরি খেলিবার কারণ বুঝিয়া ওঠা শক্ত হইতে পারে, কিন্তু এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের পরস্পরের মধ্যে এইটুকু পর্দ্দার অন্তরালই ইহাদিগের চরিত্রের একটী বিশেষত্ব।

যাহা হউক, এদিকে তারিণীও কুটীলতায় চাণক্যকেও এক হাত খেলাইয়া আসিতে পারেন। তাহার ন্যায় সাতজন চন্দরকে একবার মাত্র সঙ্গে রাখিয়া সাতহাটে চৌদ্দবার বিক্রয় করিয়া আসিতে তিঁনি সমর্থ। তিঁনি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতেছিলেন যে চন্দর শুধু আপনাকে 'সামাল্' দিতেছেন মাত্র। সেইজন্য তিঁনিও যেন ক্রমশঃ না বুঝিয়াই ধরা দিতেছেন এইরূপে বলিলেন—আরে রামঃ। অমূল্যটা কল্‌কেতায় থেকে নিজের ধাক্কা নিজেই সাম্‌লে উঠ্‌তে পারে না, আবার রোজগার করে সংসার চালাবে—ফুঃ।

শুনিয়া চন্দর তো ভীষণ গবেষণার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। গভীর চিন্তামগ্নভাবে তিনি আপন হস্তের অঙ্গুলি গণনা দ্বারা অধিকতর নিম্নস্বরে আপন মনেই বলিতে লাগিলেন—এই ধর না কেন, সংসারের মধ্যে তো তিনটি; তা'র মধ্যে হারাণ যা' আনে তা'তেই দিনান্তে অন্ন জোটে না; অমূল্যটা এখনও কিছু রোজগার করে না; অথচ বাড়িতে মাছের মুড়ো আস্‌ছে, রীতিমত সমারোহ চল্‌ছে—!

দুরূহ সমস্যা! চন্দর হাল ছাড়িয়া বলিলেন—নাঃ। তারিণী, তুমি ভাবালে, কথাটা ভাল ঠেক্‌ছে না।

তক্তাপোষের উপর সজোরে চপেটাঘাত করিয়া তারিণী বলিলেন—আরে ভাল কথাতো নয়ই। এ আর বুঝ্‌ছোনা? চন্দর, ভেবে দেখ, আমাদের এ সোনার সংসারটা ভাঙ্‌লো কিসে? আমি কি ভাদ্দর বোয়ের গায়ে হাত তোল্‌বার লোক?

যেন জীবনে কখনও এরূপ কথা শুনিবার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না এই ভাবে চন্দর একটী প্রকাণ্ড 'হুঁ!' করিয়া তারিণীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

তারিণীর তখন রোখ্ চড়িয়া গিয়াছে। তিঁনি যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে হারাণের অপ্রাপ্য ও অশোভন সৌভাগ্যের সূচনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিতে হইলে—নান্যঃ পন্থা অয়নায়। তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধ হইবার এই একটীমাত্র পথ এখনও তাঁহার সম্মুখে বর্ত্তমান।

অতএব তারিণী বিষয়টীকে সমাপ্তির দিকে লইয়া চলিলেন; বলিতে কুণ্ঠাবোধ হইল না, কর্ত্তব্যে বাধিল না, লজ্জা রহিল না, জিহ্বা খসিয়া পড়িল না, বাক্‌শক্তি রোধ হইল না; তিঁনি কহিলেন—চন্দর, তখন তোমরাও কোন্ না এসেছিলে? কিন্তু ঘুণাক্ষরেও আমার

মুখ থেকে এ সব কিছু শুনেছ? ঘরের কেচ্ছা কেমন করে বলি, এঁ্যা? একটা কথা আছেতো? বলনা হে?

মনের আনন্দ মনের মধ্যেই গোপন করিয়া চন্দর যেন দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্নিতে ইন্ধন জোগাইতে লাগিলেন—ঠিকই তো! হাজারই হোক্, তুমি হ'লে গিয়ে জ্ঞানবান্, বুদ্ধিমান্ বেক্তি! তাইতো বলি, তুমি আমাদের পরামর্শ না নিয়ে কোন কাজ কর না; আর সেদিন, মেহেরপুরের খাজনাটা আদায় করে এসেই দেখি কিনা সেই ব্যাপার! লাথি! লাথি বলে লাথি! একেবারে গর্ভপাৎ! একি কম রাগে, কম দুঃখে তোমার মত লোকে সহজে করে!

ঝটিতি একবার চতুর্দ্দিক দেখিয়া লইয়া, চন্দরের গা'টিপিয়া তারিণী নিম্নস্বরে বলিলেন—গিলে খাও, চন্দর গিলে খাও! এ নেহাৎ তোমাকে বলেই বল্লুম; কথাটা যেন আর পাঁচকান্ না হয়, হাজারই হোক্ ঘরের কেলেঙ্কারি তো বুঝ্‌লে না?

মস্তক আন্দোলন দ্বারা চন্দর জানাইলেন যে তিনি যথেষ্টই বুঝিয়াছেন। পরে কথাটী গোপনে রাখিবার আশ্বাস দিয়া, নামমাত্র অন্য দুই একটী অপ্রয়োজনীয় আলোচনা করিয়া, কালে কালে আরও কত কি দেখিতে হইবে, এই আক্ষেপ করিতে করিতে চন্দর অবশেষে গাত্রোত্থান করিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিয়া তারিণী মৃদু হাস্য করিলেন। পথে যাইতে যাইতে আসন্নসন্ধ্যার আলো-অন্ধকারের ছায়ায় চন্দর অনতিদূরে অস্পষ্টভাবে দেখিলেন কে যেন লাঠির ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে তাহারই দিকে আসিতেছে। তিনি হাঁকিলেন—কেহে?

উত্তর আসিল—চন্দর না?

চন্দর সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন—নিতাই নাকি?

নিতাই বলিলেন—হ্যাঁ। যাচ্ছি একবার চক্কোত্তির ওখানে। তুমি কোত্থেকে?

কৌতূহলোদ্দীপক অপূর্ব্বমুখভঙ্গী করিয়া চন্দর বলিলেন—তারিণীর ওখান থেকে।

সোৎসুক হইয়া নিতাই বলিলেন—বটে! কিছু নূতন খবর আছে নাকি?

এইরূপ প্রশ্ন করা নিতাইয়ের পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই। পঞ্চায়েতের বৈঠক হওয়া পর্য্যন্ত তারিণীর বাটীটী একরূপ গ্রামের সর্ব্বপ্রকার রহস্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেদিন বাগ্দীপাড়ার তিনকড়িদুলে কেন যে তাহার যুবতীস্ত্রীকে মধ্যরাত্রে খিড়্কির পুষ্করিণীতে ডুবাইয়া মারিতে গিয়াছিল সে গুপ্তকথা আর কেহ না জানিলেও তারিণীর বৈঠকখানায় তাহা অভিনব উপায়ে সর্ব্বাগ্রে আসিয়া পঁহুছিয়াছে; ক্ষেমাঙ্গিনীর বিধবা কন্যা কেন যে গলায় দড়ি দিবার জন্য শয়নকক্ষের আলনায় বস্ত্র বাঁধিয়াছিল সে কথা সকলে গোপন করিলেও তারিণীর বৈঠকখানায় যেন তাহা ভৌতিক উপায়েই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে; আজ তিন দিনও হয় নাই, তারিণীর বিচক্ষণতায়ই গ্রামস্থ সকলে এক মহাপাপ হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে; অধিক বিলম্ব হইলেই প্রাণকালী ভট্টাচার্য্যের মৃতদেহ সকলেই স্পর্শ করিয়াছিল আর কি? প্রাণকালী যে উমাকান্ত ভট্টাচার্য্যের ঔরসজাত সন্তান নহে সে রহস্য তারিণীর বৈঠকখানাতেই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাই না রক্ষা!

তারিণী পঞ্চায়েতের মাতব্বরশ্রেণীভুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত এ সকলই সম্ভব হইয়াছে; তারিণী আজ মোড়ল না হইলে কাহার সাধ্য ছিল যে ধর্ম্মের এমন সূক্ষ্ম গতি অনুসারে দিগ্‌গজপুরটাকে কেহ চালিত করে? তারিণীর প্রশংসায় গ্রামখানি যতই ভরিয়া উঠিতে লাগিল তাঁহার

বৈঠকখানায় চন্দর নিতাই প্রভৃতির তাম্রকূটসেবন ততই ভীষণভাবে নিয়মিত হইয়া পড়িল।

এ হেন তারিণীর আড্ডা হইতে চন্দর প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন! তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তরগুলাও যে স্বরে কণ্ঠ হইতে নির্গত হইতেছিল তাহাও বিশেষকৌতূহলোদ্দীপক! অতএব নিতাই এরূপ প্রশ্ন করিতেই পারেন!

শুনিয়া চন্দর কৃত্রিম কোপপ্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন—বিলক্ষণ! পরের কথা রাস্তায় ঘাটে বলে বেড়ানটা কি ভাল হে, নিতাই!

নিতাইয়ের শেষ সন্দেহটুকুও অপসৃত হইল; এবং সঙ্গে সঙ্গে চক্কোত্তির বাটীতে তিনি যে কি আবশ্যকে গমন করিতেছিলেন তাহাও কেমন তাহার বিস্মরণ ঘটিল। তিনি মহাআগ্রহের সহিত বলিলেন—এস এস চন্দর, সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হোল; ঐ ঘাটের পাড়েই একটু বসে যাওয়া যাক্!

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে, একরূপ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়াই চন্দর, নিতাইয়ের সহিত উল্লিখিত স্থানে উপবেশন করিয়া কিছুক্ষণ পরমানন্দে সদালাপ করিলেন। তৎপরে নিতাই সন্ধ্যাহ্নিকের কথা বিস্মৃত হইয়া, 'পড়ি কি মরি' করিতে করিতে চক্কোত্তির নিকট উপস্থিত। সবিশেষ অবগত হইয়া চক্কোত্তি লাফাইয়া উঠিলেন। সেই রাত্রেই তাহার একছটাক লঙ্কার বিশেষ প্রয়োজন বোধ হইল এবং অবিলম্বে শ্রীদামের দোকানে গিয়া ভেলু মণ্ডলকে সকল কথা একটু রসাল করিয়া শুনাইয়া দিয়া মণ্ডলপুত্রকে একেবারে 'থ' করিয়া দিলেন। ভেলু যেন পাকস্থলীর একটা ভীষণ বেদনার বেগ সাম্‌লাইতে সাম্‌লাইতে নিতাইএর প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বল কি দা'ঠাকুর?

শামুকের মধ্য হইতে জুতসই একটিপ্ নস্য গ্রহণ করিয়া নিতাই গম্ভীরভাবে বলিলেন—তখনই তো বলেছিলুম। কলি চারপো' হতে আর মোটে আটান্নটী বচ্ছর আর তেরটী দিন বাকী। এ আর নূতন কথা কি রে ভেলু ?

৮

"আমি তোমার হাঁড়ির খবর জানি" একথা যে ব্যক্তি না বুক ফুলাইয়া পাঁচজনকে বলিতে পারিল তাহার মানবজন্মই বৃথা। অপবাদ মিথ্যাই হউক্ বা সত্যই হউক্ ভদ্রব্যক্তির নিকট তাহা চিরকালই আতঙ্কের কারণ। অতএব, 'চালাকি করিলে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিব' একথা যে কেহই বলুক না কেন তাহাকে বিশেষ সমিহ্ করিয়াই চলিতে হয়। লোকের নিকট ত্রাশমিশ্রিত সম্মান লাভ করিবার এহেন দিব্যাস্ত্র, আর যে কেহই হউক, বাঙ্গালী কখনও সহজে ত্যাগ করিতে পারে না; করিলে ইহাদের জীবনধারণ করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। নানাবিধরোগে কণ্ঠাগতপ্রাণ, অন্নাভাবে অস্থিচর্ম্মসার, বস্ত্রাভাবে উলঙ্গপ্রায় হইয়া আজ ইহাদের আর আছে কি?

বীরত্বের এইটুকু দাবী রক্ষা করিতে গিয়া পরনিন্দাকে আজ ইহারা জীবনের সারব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তাইতো পরকুৎসা করিতে

বসিলে বাঙ্গালী আজ স্নানাহার ভুলিয়া যায়, পুত্রশোক বিস্মৃত হয়, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারাইয়া ফেলে ! শুধু রসনাগ্রনিহিত বাক্‌শক্তির দ্বারা যে যাহা নহে তাহাকে তাহাই করিতে এমন সুপটু জাতি পৃথিবীপৃষ্ঠে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

দিগ্‌গজপুরে বাঙ্গালীর বাস। এখানে তারিণী হইতে শ্রীদাম মুদীটি পর্য্যন্ত সকলেই বাঙ্গালী। অতএব এখানেও বাঙ্গালীর এই চিরপ্রসিদ্ধ স্বভাবটীর কোনও ব্যতিক্রম দেখা গেল না। হারাণের বাটীর গুপ্ততথ্যটী বেতারসংবাদের ন্যায় নিমেষে চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কিন্তু যথেষ্ট সঙ্গোপনে ও সন্তর্পনে ; যেন শ্রোতার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া আবার মুখ হইতে অসাবধানে না বাহির হইয়া যায় !

সারা গ্রামটির মধ্যে কিন্তু একজনের নিকট এ নিয়ম খাটিল না। সে ব্যক্তি শঙ্কর মুখুর্জ্জে। তিনি হারাণদের অত্যধিক স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়াই হউক অথবা গ্রামবাসীদিগের সহিত বেশী ঘনিষ্ঠতা বা মেলামেশা করিতেন না বলিয়াই হউক, এ সকল সংবাদ তাহার কর্ণে সহজে প্রবেশ করিতে পারিত না। তাহার কয়েক বিঘা ধানের ক্ষেত, দুইটী পুষ্করিণী ও কয়েকটী হাল ও গরু ছিল। সারাদিবস আপ্রাণ পরিশ্রম করিবার পর গৃহে আসিয়া, সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া, ইন্দু ও ইন্দুর জননীর সহিত দুই একটি কথা কহিতেই রাত্রি হইয়া পড়িত। তাহারপর আহারান্তে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া তিনি সংসারের প্রাত্যাহিক হিসাব শেষ করিতেন। নিজের দৃঢ় অটুট স্বাস্থ্য, মনের অদম্য তেজ ও মুখের হাসি লইয়াই তাহার জীবন অতিবাহিত হয়। পরকুৎসা করিবার মত অবসর বড় ঘটিয়া উঠে না। দোষের মধ্যে, তিনি কাহারও অত্যধিক অন্যায় দেখিতে পারিতেন না ; দেখিলে

তাহার ক্রোধ হইত ; এবং ক্রোধ হইলে তাহার দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকিত না, যাহা হয় একটা করিয়া বসিতেন।

সেদিন সন্ধ্যাকালে তিনি দুইসের লবণ ক্রয় করিবার নিমিত্ত শ্রীদামের দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীদাম লবণ ওজন করিতে করিতে বলিল—বলত ঠাকুর্দ্দা ? এই বামুন্ কায়েতের ঘরে এমন সব চল্‌তি থাকলে আমরা কোথা গে দাঁড়াই ?

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন—কেনরে ছিদেম ?

জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া শ্রীদাম বলিল—কাজ কি ঠাকুর্দ্দা, ছোট মুয়ে বড় কথা কয়ে ?

সহাস্যে শঙ্কর বলিলেন—তা না বলিস্ নেই নেই বাপু, দে মুন্‌টা ওজন ক'রে।

শঙ্করকে দর্শন করা অবধি শ্রীদামের কিন্তু পাকস্থলী ফুলিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। শুধু লবণ দিলেই তো চলিবে না! তাই যেন কতকটা আপন মনেই বলিতে লাগিল—এত দিন গাঁয়ে আছি, কিন্তু বাপের জম্মে এমন অনাছিষ্টির কথাও শুনিনি—

শঙ্কর কিঞ্চিৎ অধৈর্য্যের সহিত বলিলেন—কি এমন অনাছিষ্টির কথা রে বাপু ? তাই না হয় খুলেই বল্‌না, চুকে যাক্।

গম্ভীরভাবে শ্রীদাম বলিল—চুকে কি গেলেই হো'ল ঠাকুর্দ্দা ? এতো আর যা'র তা'র বাড়ীর কথা নয়, একেবারে হারাণ ঠাকুরের বাড়ীর কথা!

হারাণদা'র বাড়ীর কথা! শঙ্কর আশ্চর্য্যবোধ করিলেন। ইহারই মধ্যে অমূল্যদের বাটীতে কি এমন ঘটিয়া গেল যাহা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না, অথচ গ্রামের এই মুদিটী পর্য্যন্ত তাহাই লইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেছে ? সম্যক্ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন ? তাঁদের কি হয়েছে রে ?

শ্রীদাম শঙ্করের কৌতূহলকে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিয়া অবশেষে বিশেষ রসালভাবে অন্নপূর্ণার নামের অপবাদটী যে সদ্য তারিণীর বাটী হইতে আসিয়াছে তাহা সবিস্তারে শুনাইয়া দিল।

শুনিয়াই ক্রোধে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া, লবণের ঠোঙ্গাটা সজোরে শ্রীদামের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া শঙ্কর বাটী ফিরিলেন।

কি ? এতদূর স্পর্দ্ধা ! সতীলক্ষ্মী অন্নপূর্ণার নামে অপবাদ ? দু'টী অন্নের জন্য আজ যাঁহারা ভিখারী বলিলেই হয়, অমূল্য বাটী আসা পর্য্যন্ত তাঁহাকে দুইবেলা দুইমুঠা অন্ন দিতে গিয়া যাঁহাদিগকে গোপনে উপবাস করিতে হয়; সপ্তাহের মধ্যে দুইতিনদিবস যাঁহাদিগকে তাহারই বাটী হইতে চাউল কর্জ্জ করিয়া লইয়া যাইতে হয়—উপবাস হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য, তাঁহাদের এই দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষনের উপর আবার অপবাদ! আর তাহাই দিল কি না তারিণী ? যাহার চরিত্র স্মরণ করিতে গেলেও— !

শঙ্করের সর্ব্বশরীর রাগে রি রি করিতে লাগিল।

বাটীতে প্রবেশ করিয়া তিনি ডাকিলেন—ইন্দুর মা।

ইন্দুর জননী নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ?

শঙ্কর চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন—তারিণীর আক্কেল্‌টা শুনেছ ?

শুনিয়াছিলেন তিনি সবই। শুধু লজ্জায়, ঘৃণায় স্বামীকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারেন নাই।

শঙ্কর গৃহের কোণ হইতে একটী লাঠী বাহির করিতে করিতে চিৎকার করিয়া বলিলেন—কি ? চুপ্‌ করে রইলে যে ? শুনেছ পাষণ্ডটার আক্কেল ? অনুদি'র নামে—

বলিতে বলিতে মধ্যপথে থামিয়া গিয়া ক্রোধে মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন—কিন্তু এর একটা বিহিত যদি না করে আস্‌তে পারি

ইন্দুর মা, তো শঙ্কর মুখুর্জ্জের নাম আর তোমরা এ গাঁয়ে শুন্‌তে পাবে না— !

বলিয়া তিনি হাতের লাঠীটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। ইন্দুর জননীর মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি স্বামীর স্বভাব বিলক্ষণই জানিতেন। এইজন্যও তিনি সব কথা জানিতে পারিলেও স্বামীকে পূর্ব্বে কিছু বলিতে সাহস করেন নাই।

কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার মত দাঁড়াইয়া থাকিবার পর যখন তাহার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি যে তাহার স্বামীকে কোনরূপে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই তাহা দেখিয়া বড়ই ভীতা হইয়া পড়িলেন।

এতক্ষণে না জানি তিনি কি কাণ্ডই বাধাইয়া বসিয়া আছেন !

তাহার মনে পড়িল, আর একবার তিনি স্বামীর এইরূপ ভীষণ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। গত বৎসর মুসলমান পাড়ার ক্ষেতে যখন ঐ তারিণীরই একটা গাভী গিয়া ধান্যশীর্ষ চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং অনতিবিলম্বেই গুণ্ডাসর্দ্দার আলিমিঞা তাহার দলবলসহ আসিয়া নির্ম্মম প্রহারের দ্বারা ঐ গাভীটিকে ভূতলশায়ী করিয়া ফেলিয়াছিল, তখন তাহার স্বামীর সে কি রুদ্রমূর্ত্তি ! স্মরণ করিতে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয় ! গো হত্যার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত সারা দিগ্‌গজ-পুরের মধ্য হইতে একা তাহার স্বামীই ছুটিয়া বাহির হইলেন এবং সম্মিলিত লাঠীয়াল গুণ্ডাদিগের মধ্য হইতে আলিমিঞাকে টানিয়া আনিয়া যখন অসীমবলে তাহার পা ছুইটা ধরিয়া, ঘুরাইয়া তাহাকে শূন্যে তুলিলেন তখন গ্রামস্থ সকলে তাঁহাকে একযোগে না ধরিয়া ফেলিলে যে কি বিপদই ঘটিত তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামীই জানেন। আজ আবার একি সর্ব্বনাশ উপস্থিত ! ছি ! ছি ! তারিণী না গ্রামের মোড়ল হইয়াছে ? তাহার এই আচরণ ! মানুষ না পশু সে ?

আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তিনি উদ্বেগাকুলকণ্ঠে ডাকিলেন—ইন্দি!

ইন্দু এতক্ষণ হারাণের বাটীতে অন্নপূর্ণার নিকট বসিয়া গল্প শুনিতেছিল; কিন্তু সোনাপাখীর দ্বারা সুয়োরাণীর দন্তপংক্তি স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া লইতে তাহার এতখানি সময় গেল যে সন্ধ্যার অন্ধকারে অমূল্যর সহায় ব্যতীত একাকী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করা আর তাহার সম্ভবপর হইল না। অপদেবতার ভয় ও বটে, জননীর মৃদু তিরস্কারের আশঙ্কাও বটে।

অমূল্যকে শিখণ্ডীস্বরূপ সম্মুখে রাখিয়া যখন সে ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিতেছিল তখন সহসা জননীর আহ্বান কর্ণগোচর হওয়ায় সে তৎক্ষণাৎ অমূল্যর হাতখানি সবলে আঁকড়িয়া ধরিল। আর না পারিল পলায়ন করিতে, না পারিল একপদ অগ্রসর হইতে। শুধু অমূল্যর হাতখানি প্রবল আগ্রহে ধরিয়া তাহারই বিচক্ষণতার উপর আপন ভবিষ্যৎ একান্তে সমর্পণ করিয়া দিল।

ইন্দুর সহিত অমূল্যকে দেখিয়া ইন্দুর জননী যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া উদ্বেগাকুলস্বরে বলিলেন—এই যে বাবা এসেছ? শীগ্‌গীর, বাবা, শীগ্‌গীর। তোমার মোসোকে তোমার জ্যেঠার ওখান থেকে ফিরিয়ে আন।

সহসা এইভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া অমূল্য যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। তাঁহার এরূপ ব্যস্ততার কোন কারণ সম্যক্ অনুধাবন করিতে না পারিয়া সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে মাসী? অমন কর্চ্ছ কেন? ইন্দুর জননী কহিলেন—ওরে বাছা, আর কথা নয়। এতক্ষণ সেখানে কি কাণ্ড হ'ল কে জানে! রাগ্‌লে তো ওঁর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না! যাও বাবা, আর দাঁড়িও না!

তাঁহার আশঙ্কা ও ব্যস্ততা দেখিয়া অমূল্য বুঝিল যে এক্ষণে কোনও

প্রশ্ন করা বৃথা। যাহাই হউক্, অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সে এইটুকু ধরিয়া লইল যে তারিণীজ্যেঠার বাটীতে শঙ্কর মেসো ক্রোধের বশেই গিয়াছেন, একটা কাণ্ড বাঁধাতে। অতএব পূর্ব্বে সেইস্থলে যাওয়াই কর্ত্তব্য। অমূল্য ত্বরিতপদে বাহির হইল। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল যে বিষয়টা যথেষ্ট সরল নয়। কারণ, শঙ্কর মেসোর মত লোক পৃথিবীতে সহজে কোনও কিছুতে বিবেকভ্রষ্ট হইবার পাত্র নহেন।

৯

ভরাসন্ধ্যাবেলা পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া খড়মের ফটাস্ ফটাস্ শব্দ করিতে করিতে তারিণী যখন সন্ধ্যাহ্নিকের নিমিত্ত পূজার গৃহে প্রবেশের জন্য দক্ষিণপদটী উত্তোলন করিয়াছেন, ঠিক সেই সময়েই সদরের বাহিরে বিকৃতকণ্ঠে আওয়াজ হইল—তারিণী!

যে চরণখানি উর্দ্ধগামী হইয়াছিল সেখানি আর ভূমিস্পর্শ করিল না; শ্রবণ আপনা হইতেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিল।

কণ্ঠস্বর কিছু উচ্চে চড়িল—তারিণী!

তারিণীর হৃৎপিণ্ড সবলে দুলিয়া উঠিল। এ যেন চেনা চেনা স্বর না? ভাবিলেন, সন্ধ্যাবেলা এ আবার কি ফ্যাসাদ্! লক্ষণ তো সুবিধার বোধ হয় না! দুর্গে দুর্গতিনাশিনী! ডাকের চোটেই কাঁপুনি ধরে যে! লোকটা কে রে বাপু?

এবার দরজার পাল্লা দু'খানাও ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল—তারিণী।

নাঃ। গতিক সুবিধার নয়! তারিণী কাতরকণ্ঠে ডাকিলেন—অম্‌রা, ও অম্‌রা—একবার দেখ্ না?

অম্‌রা অর্থাৎ অমরনাথ তখন অঙ্গনের একপার্শ্বে বসিয়া সিদ্ধি বণ্টন করিতেছিল। পিতার আহ্বানে বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল—অম্‌রা অম্‌রা কেন? নিজেই দরজাটা খুলে দেখ না?

ক্রোধে, 'ব্যাটা তো নয়!' বলিয়া, অনন্যোপায় তারিণী কনিষ্ঠপুত্রের শরণাপন্ন হইলেন—ওরে ভোলা, তুইই না হয় একবার ওঠ।

ভোলানাথ সকলই শুনিতেছিল। কিন্তু মৎস্য ধরিবার হুইলে সুতা গুটান তখনও তাহার শেষ হয় নাই। এতক্ষণে তাহার প্রারব্ধ কর্ম্ম সমাপন করিয়া, নেহাইৎ দরজায় পুনঃ পুনঃ আঘাতে অতিষ্ঠ হইয়া, 'আচ্ছা জ্বালাতন তো' বলিয়া সে দরজা খুলিয়া দিল।

দরজা খুলিতেই শঙ্কর ভিতরে আসিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোর বাপ্ কোথায় রে?

দূর হইতে তারিণী শঙ্করকে লাঠিহস্তে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত পূজার গৃহের মধ্যে গিয়া ভিতর হইতে দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিলেন।

এদিকে ভোলানাথ, শঙ্করের ভাবগতিক দেখিয়া তাহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্বটুকু গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে সরিয়া পড়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করিল।

কাহারও নিকট কোনও উত্তর না শুনিয়া ক্রোধে শঙ্করের পদদ্বয় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন—এই কে আছিস্ বল্‌না, সে নচ্ছার্‌টা গেল কোথায়?

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই অমরনাথের হস্ত হইতে শীলের নোড়াটা খসিয়া

পড়িল এবং চকিতে সিদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যে সে অদৃশ্য হইয়া গেল তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

ভিতর হইতে তারিণী 'নবমীর পাঁঠা'র ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে, অথচ কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট কোপপ্রকাশপূর্ব্বক হুঙ্কারত্যাগ করিলেন—কে রে অম্‌রা? সন্ধ্যাহ্নিকের সময় বাড়ীর ভেতর এসে হল্লা কর্‌ছে?

ব্যস্‌। শঙ্কর এক লম্ফে পূজার গৃহের দ্বারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন ও লাঠি উত্তোলন করিয়া বলিলেন—আয়, আয়, পাষণ্ড! কেমন করে মায়ের সম্মান, ভাদ্দরবৌয়ের ইজ্জৎ রাখ্‌তে হয় তা—

বাক্যসমাপ্ত না হইতেই অমূল্য ছুটিয়া আসিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—শঙ্কর মেসো, শঙ্কর মেসো, একি কর্চ্ছেন্‌ বলুন্‌ তো?

অমূল্যকে দেখিয়া শঙ্কর চমকিত হইলেন। তীব্র আক্ষেপের স্বরে তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন—তুই আবার এখানে এলি কি বলেরে অমূল্য?

অমূল্য তাহার হস্তাকর্ষণ করিয়া কহিল—সে কথা পরে বল্‌ব। আগে বাড়ী চলুন্‌ দেখি! আজ আপনার হয়েছে কি?

'কি হয়েছে?' শঙ্কর সজোরে অমূল্যর মুষ্টি হইতে আপন হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া বলিলেন—কি হয়েছে? শুন্‌বি? তোর এই নরপিশাচ জ্যেঠার কীর্ত্তি শুন্‌বি অমূল্য?

হঠাৎ শঙ্করের চমক্‌ ভাঙ্গিল। এ তিনি কি বলিতে যাইতেছেন? অমূল্য সে কথা শুনিলে কি সহ্য করিতে পারিবে? ঐ একে একে গ্রামের চন্দর, নিতাই প্রভৃতি আসিতেছে; উহাদের সাক্ষাতে একথা শুনিলে, নিষ্পাপ, নিরপরাধ এই বালক যে ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায়,

ঘৃণায়, অপমানে মাটিতে মিশিয়া যাইবে! হয় তো বা বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া আত্মহত্যাই করিয়া বসিবে!

একটা কিছু করিতে না পাইয়া রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে শঙ্কর অবশেষে আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—তুই কেন এলি অমূল্য? তুই কেন এখানে এলি?

অমূল্যর আগমনে শঙ্কররূপ জলৌকার মুখে লবণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে উপলব্ধি করিয়া তারিণী দেবতার গৃহে, উপাস্য বিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া যেরূপ প্রাণভরিয়া হাসিতে লাগিলেন তাহাতে শয়তানও, বোধ হয়, মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কুচিত হইল।

লোকসমাগম হইতেছে দেখিয়া অমূল্য একরূপ জোর করিয়াই শঙ্করকে টানিতে টানিতে বাহিরে লইয়া গেল।

শঙ্কর ও অমূল্য প্রস্থান করিলে আগন্তুকগণ আদ্যোপান্ত ব্যাপারটী জানিবার জন্য যখন একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন তখন গৃহের মধ্য হইতে শ্রুত হইল—

জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে, অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী। বেটা শঙ্করা এসেছিল কিনা আমার বাড়ী চালাকী কর্ত্তে? কি বল্‌ব, আহ্নিকে বসে গিয়েছিলুম, ওঠ্‌বার উপায় ছিল না; নয়তো, বাড়ী চড়াও হওয়ার মজাটা টের পাইয়ে দিতুম্। হুঁঃ।

বলিতে বলিতে মুক্তকচ্ছ সাম্‌লাইয়া তারিনী দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন।

'তারিণীকে দেখিয়া সমাগত ব্যক্তিগণ অবিলম্বে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিলেন। কি হয়েছিল্ তারিনী? এসব কি কাণ্ড?

চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার উপর অজস্রপ্রশ্নবৃষ্টি হইতে লাগিল।

তারিণী বলিলেন—ওই যে বল্লুম্ হে; আহ্নিকে বসে পড়েছিলুম্; নয়তো দেখিয়ে দিতুম্, কত ধানে কত চাল!

এইটুকুমাত্র গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করিয়াই তারিণী হাতে হাতে শঙ্করের বাড়ীচড়াও হইয়া অপমান করিতে আসিবার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন।

বাল্যকালে চাণক্যশ্লোকে যখন 'সর্প হইতে খল ক্রূর' মুখস্থ করিতে হইয়াছিল তখন ভ্রমেও মুহূর্ত্তের জন্য মনে হয় নাই যে ভবিষ্যতে যাহাদের লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে, যাহাদের সুখ দুঃখকে আপনার সুখ দুঃখ জ্ঞান করিয়া চলিতে হইবে, তাহারাই একদিন সত্য সত্য সর্প হইতেও ক্রূর হইয়া দংশন করিতে ছুটিয়া আসিবে। চাণক্য পণ্ডিতের উক্তিটি বাস্তবজগতে সত্যের আকারে এইরূপ মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে জানিতে পারিলে অনেকেই বোধ হয় জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই সংসারত্যাগ করিয়া অরণ্যের আশ্রয় লইতেন।

অবশ্য ইহা অনুমান করা আদৌ অযৌক্তিক নহে, যে তারিণী যখন এরূপ কাপুরুষ যে শঙ্করের ভয়ে ভীত হইয়া পূজার গৃহে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন, তখন অন্ততঃ প্রাণের ভয়েও অন্নপূর্ণার নামে আর অনর্থক বিষ উদ্গীরণ করিবেন না। কিন্তু যাহা অস্বাভাবিক নহে তাহাই যে সর্ব্বক্ষেত্রে ঘটিবে, এমন কোনও কথা নাই। থাকিলে, মানুষের মনকে শয়তানের অগোচর বলা চলিত না।

অতএব শঙ্কর পশ্চাৎ ফিরিতেই তারিণীচরণ পুনরায় দংশন করিতে উদ্যত হইলেন। উৎসুকশ্রোতাগণ পরিবেষ্টিত হইয়া তিঁনি জাঁকিয়া বসিলেন, শিক্ষাগ্রহণের পরিবর্ত্তে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে। শঙ্করের আচরণে তারিণীর চক্ষু খুলিয়া যাওয়াই উচিত ছিল। ভ্রাতৃবধূর নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া যে মনুষ্যত্বহীনতার পরিচায়ক তাহাতে আর

সন্দেহ কি ? কিন্তু যে ব্যক্তি পরশ্রীকাতরতায় অন্ধ সে কখনও এইরূপ ঘটনায় আপনাকে সংশোধন করিয়া লইতে পারে না, বরং এইরূপ ক্ষেত্রে তাহার অন্তরমধ্যে লুক্কায়িত হিংসাগ্নি ঘৃতাহুতিই পাইয়া থাকে।

তারিণীর ও তাহাই হইল। তিনি ভাবিলেন—বটে ! শঙ্কর এসেছিল অমূল্যদের পক্ষ লইয়া, আমি তারিণী চাটুর্জ্জ্যে, আমাকে শাষাইতে। বড় আপনার লোক না ? আচ্ছা ! এক বঁড়্‌শিতে যদি হারাণকে ও শঙ্করকে না গাঁথ্‌তে পারি, তবে বৃথাই এতদিন গাঁয়ের মোড়লী করিলাম।

শঙ্করের এই অপ্রত্যাশিত আস্ফালনের কারণ জানিবার নিমিত্ত উপস্থিত জনমণ্ডলীর অত্যধিক আগ্রহ ও অলঙ্ঘ্য অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়াই তারিণীকে যেন অবশেষে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই নিজপরিবারের গুপ্ততথ্য কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিতে হইল ; এবং অন্নপূর্ণার সহিত ঐ শঙ্করেরই যে এক অভিনব সম্বন্ধ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা বলিয়া ফেলিয়া 'তাইতো কি করিলাম' এইভাবে যথেষ্ট অপ্রস্তুত ও অনুতপ্ত হইয়া পড়িলেন !

ইহা লক্ষ করিয়া তারিণীর ভাবাবেশকে অধিকতর মনোজ্ঞ করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে চন্দর বলিলেন—কপালের লেখন্ কে খণ্ডাবে বল তারিণী ? একটা মেয়েমানুষের জন্যে কিনা ? নাঃ। ও তোমার ভায়েরও যেমন অদেষ্ট, তোমারও তেমনি বল্‌তে হবে। তোমাদের দু'জনের চুণকালিমাখাই সার হ'ল ! কিন্তু মজা যা'রা লুট্‌বার তা'রা ঠিক্—বুঝ্‌লে কি না ?

নিতাই বলিলেন—কপালং মূলম্। শাস্ত্রবাক্য ! আক্ষেপ বৃথা তারিণী !

চক্কোত্তি এতক্ষণ চুপ্ করিয়া বসিয়াছিলেন। এক্ষণে অবসর বুঝিয়া বিস্ময়সূচকস্বরে কিঞ্চিৎ আক্ষেপরস মিশ্রিত করিয়া বলিলেন—

কিন্তু, তারিণী, তোমার ভায়েরও বাহাদুরী বল্‌তে হবে যে ঐ চরিত্রের একটা স্ত্রীলোককে এতদিন ঘরে পুষে রেখেছেন! আর অমূল্যটাও দেখ্‌ছি এত লেখাপড়া শিখেছে না অশ্বডিম্ব করেছে! ফাঁকি—ফাঁকি—ও পাশ্‌ টাশ্‌ সব ফাঁকি। বুঝ্‌লে না? নয়তো আমরা এমন দেখ্‌লে নির্ঘাৎ একটা খুন্‌খারাপি করে বস্‌তুম! আরে ছিঃ ছিঃ! তুমি পৃথক্‌ হয়েছ না বেঁচে গেছ!

দীর্ঘনিঃশ্বাসত্যাগ করিয়া তারিণী কহিলেন—তা আর বল্‌তে! শঙ্করের এত মেশামিশি কি আমি আজ লক্ষ করছি? জানি, একদিন না একদিন ওদের একঘরে হ'তে হবেই; মাঝ থেকে, সাতে নেই পাঁচে নেই, আমাকে নিয়েও না টান্‌ পড়ে। দরকার কি চক্কোত্তি? ও আগে থাক্‌তেই সাম্‌লানো ভাল!

'একঘরে' কথাটী শুনিয়া চন্দর,তারিণীর উদ্দেশ্যটী অবিলম্বেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। অতএব বলিলেন—সাম্‌লেছ না বেঁছে গেছ! এ ব্যাপারের পর আর জাতধর্ম্ম ক্ষোয়াতে ওদের সঙ্গে কে মেলামেশা রাখ্‌বে? হ্যাঃ। একঘরে তো ওদের হ'তেই হবে, কি বলহে নিতাই?

নিতাই একবার চক্কোত্তির দিকে চাহিলেন; চক্কোত্তি মণ্ডলের উপর একটী কটাক্ষ হানিলেন; যেন—কিহে তুমি কি বল?

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল; কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। ভীষণ ঝড়ের পূর্ব্বাভাষ বলিলেই হয়। তাহারপর ধীরে ধীরে বাতাস সুরু হইল।

চক্কোত্তি জজ্‌সাহেবের রায় দিবার ন্যায় বলিতে লাগিলেন—দেখ তারিণী, তুমি হ'লে গাঁয়ের মোড়ল, পঞ্চায়েতের মাথা। আমাদের কিছু বলা বেশীর ভাগ। অবিশ্যি স্বীকার করি, হারাণ তোমার মা'র পেটের ভাই। কিন্তু যখন এতদূর গড়িয়েছে তখন ধর্ম্মের দিকে চেয়ে

কথা কইতে হয়। শেষ বয়সে পাপের ভাগী তো আর হ'তে পারব না তারিণী? তা' ছাড়া আমরা স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘর করি। সাবধান না হ'লে চলে কৈ?

চন্দর লাফাইয়া উঠিলেন—বিলক্ষণ! সাবধান তো হতেই হবে! বল কি? একি যে সে কথা! তাই বলি মা'র পেটের ভাই গেল, ভাইপো গেল, কোথাকার কে একটা শঙ্করা তারই বা ওদের ওপর অত টান্ কিসের রে বাপু? তা ভেতরে এত ব্যাপার আগে কে জান্‌তো বল? আর দেখ নিতাই, তারিণী যখন নিজমুখেই সব প্রকাশ করলে, তখন বলতেই হবে যে ভায়ের জন্যে পাপের প্রশ্রয় দিতে সেও রাজী নয়। বুঝ্‌লে না?

তারিণী মুখখানিকে যতদূর সম্ভব বিষণ্ণ করিয়া কহিলেন—কি করি বল নিতাই, মোড়ল হওয়ার অনেক দুঃখ; এতে দরকার হ'লে নিজের ডানহাতখানাও কেটে ফেল্‌তে হয়। লাগ্‌ছে বল্‌লে চলে না।

চক্কোত্তি বলিলেন—বটেইতো! বটেইতো!

পরে, সকলের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—তাহ'লে আজ থেকে শঙ্কর আর হারাণ আমাদের অপাঙ্‌ক্তেয়, কেমন?

চন্দর বলিলেন—নিশ্চয়ই! এতে আর সন্দেহ কি?

একান্ত নিরুপায়ভাবে তারিণী সনিঃশ্বাসে বলিলেন—তোমরা পাঁচজনে যা' বল্‌বে তা'তে আমি আর কি বল্‌ব বল?

চক্কোত্তি সোল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিলেন—এইতো! দধীচি মুনি পরের উপকারের জন্যে নিজের অস্থিখানাই দিয়ে দিলেন। নিজের ভাই কি তার চেয়েও কম? কি বল্‌ব তারিণী, আমি হ'লে, বোধ হয়, এতখানি পার্‌তুম্ না! এই গাঁ'টা যে তোমার ধর্ম্মেই দাঁড়িয়ে আছে তা' আমি আজ বুঝ্‌তে পার্‌লুম্।

একটীপ্ নস্য গ্রহণ করিয়া নিতাই বলিলেন—শাস্ত্রে বলে, যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ। তারিণী যতদিন আছে, আমাদের আর ভয় কি?

ধর্ম্মভীরু যুধিষ্টিরচতুষ্টয় গ্রামের সকলের সম্মুখে এইরূপে ধর্ম্মের উপর তাঁহাদের অবিচলিত আস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক, অন্য একটী গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হইল এইভাবে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১০

তাহার পরদিন সমাজচ্যুত হইয়াছেন শুনিয়া শঙ্কর তো হাসিয়াই অস্থির। হাস্যের ঘটা দেখিয়া ইন্দুর-জননী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হয়েছে? অত হাসি কিসের?

হাসিতে হাসিতে শঙ্কর বলিলেন—তা বুঝি শোননি?

ইন্দুর জননী বলিলেন—কোত্থেকে শুন্‌বো? এই দেখ! হেসেই খুন্! আগে কি হয়েছে বলেই না হয় হাস না?

শঙ্কর কহিলেন—বল্‌বো আমার মাথা আর মুণ্ড। আমরা যে একঘরে হয়েছি গো ইন্দুর মা!

ইন্দুর জননী আকাশ হইতে পড়িলেন! সে কি? তাহারা একঘরে হইলেন কি অপরাধে? সমাজচ্যুত হইবার কারণটী সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। তাহার অবস্থা দেখিয়া শঙ্কর সহাস্যে বলিলেন—কি গো? অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলে

যে? এই সোজা কথাটা আর বুঝ্‌তে পার্লে না! অমূল্যরা হ'ল একঘরে, কাজেই আমরাও তাদের সঙ্গে হলুম্ ফাউ!

গম্ভীরস্বরে ইন্দুর জননী জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাদের অপরাধ?

ক্রোধে শঙ্করের মুখভাব কঠোর হইয়া উঠিল; শুধু কণ্ঠস্বরে পূর্ব্বের হাসির রেশটুকু রাখিয়া বলিলেন—অপরাধের কথা পরে শুনো। এখন আমাদের একঘরে করেছে কা'রা জান ইন্দুর মা?

বলিয়া তিনি হস্তের অঙ্গুলি গণিয়া আরম্ভ করিলেন—আমাদের একঘরে করেছে কে? না চন্দর; যা'র বিধবা ভাইঝি কাশীতে গিয়ে সম্প্রতি এক কন্যারত্ন প্রসব করেছেন। আমাদের একঘরে করেছে কে? না চক্কোত্তি; যিনি নিজের একমাত্র ছেলেকে বাড়ী থেকে দূর করে দিয়ে, নিজের পুত্রবধূকে নিয়ে আজ ছয় বৎসর যাবৎ সুখে ঘর সংসার কর্‌ছেন, আর বছরে একবার করে তারকেশ্বর দর্শন করে আস্‌ছেন। আমাদের একঘরে করেছে কে? না নিতাই; যে রাত দুপুরে ক্ষেমী গয়লানীকে জ্যোতিষ শাস্ত্র শোনাতে গিয়ে খ্যাংরা খেয়ে ঘরে ফিরেছিল। আর আমাদের একঘরে করেছেন কে? না তারিণী; যে লোক খিড়কির ঘাটে তোমার আঁচল ধর্‌তে গিয়েছিল ব'লে, এখনও পিঠে আমার পোড়াকাঠের দাগ চাদর ঢাকা দিয়ে রাস্তায় বা'র হয়। মনে আছে তো ইন্দুর মা?

ইন্দুর জননী এতক্ষণ অবাক্ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; গতকল্যকার ঘটনার পর হইতে সকল সময়েই তাহার আশঙ্কা হইতেছিল যে তারিণীরা একটা কিছু করিবেই। তবে সে 'করাটা' যে এতদূর গড়াইবে তাহা তিনি মুহূর্ত্তের জন্য কল্পনাও করেন নাই। এক্ষণে স্বামীর কণ্ঠস্বর উত্তরোত্তর চড়িতেছে দেখিয়া তিনি সভয়ে চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া লইয়া বলিলেন—আঃ কর্‌ছো কি? এখন কি উপায় তা ভেবে দেখেছ?

শঙ্কর অবিচলিতভাবে বলিলেন—নিরুপায় বা কিসে তা'তো আমি খুঁজে পাচ্চি না, ইন্দুর মা? মনে করে বল্‌তে পার কি, যে একদিনও আমরা যেচে ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে গেছি? একটা দিনও ওদের কারও বাড়ী পাত্‌ পাড়্‌তে গেছি? বাপের ভিটেটায় পড়ে আছি, জমিটায় চাষ ক'রে খাচ্চি; একঘরে হয়েছি ব'লে এ'দুটোরও তো আর জাত্‌ যায়নি, যে আমাদের পথে বস্‌তে হবে? এ গাঁয়ে আপনার বল্‌তে এক হারাণদা'। তা তাঁরাও আমাদের সঙ্গে জাত্‌ হারিয়ে বসে আছেন্‌। ব্যস্‌। ভাব্‌বার কি আছে? তবে হাঁ। জাত্‌ গেছে বলে তুমি আর ইন্দু যদি আমায় একঘরে করতে চাও, তাহ'লে অবশ্য আমাকে উপায়ের কথাটা ভাব্‌তে হয় বৈকি!

শেষের কথা কয়টা বলিয়া শঙ্কর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। ইন্দুর জননী কিন্তু তাহার হাসিতে যোগ দিলেন না। স্বামী তাঁহার সকল কথাই বলিলেন, সকল হিসাবই করিলেন; এদিকে ইন্দু যে ত্রয়োদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দশে পদার্পন করিতে চলিল, সেদিকে তাঁহার হুঁশ কোথায়?

তিনি কহিলেন—সবই তো বল্লে! মেয়েটার কথা একবার ভেবেছ? সেও তো মাথায় মাথায় হয়ে উঠ্‌ছে।

শুনিয়া শঙ্কর কহিলেন—বিলক্ষণ! তা আর দেখিনি! দেখেছি বলেই তো তার জন্যে আর ব্যস্ত হচ্চি না?

শঙ্কান্বিতা হইয়া ইন্দুর জননী বলিলেন—কি বল্‌ছো গো?

শঙ্কর বলিলেন—বল্‌ছি ঠিক্‌ই। গৌরীদানের বয়স তো তা'র পার হয়ে গেছে! এখন যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফাঁক্‌তালে একটা পুণ্যি সঞ্চয় করে নেবে সে উপায় তো আর নেই?

ইন্দুর জননী বলিলেন—তা গৌরীদান হ'ল না বলে কি আর বিয়েই দিতে হবে না ?

—আমি কি তাই বল্‌ছি ?

—তবে ?

—তবে আর কি ? বিয়ে তার একটা হবেই। তোমরাই তো বল যে মেয়ে জন্মালেই বিধাতাপুরুষ অমনি তা'র কপালে একটী ছেলে আট্‌কে বেঁধে রেখে দেন্ ?

—তবু চেষ্টা তো মানুষের কর্ত্তে হয় ?

—চেষ্টার ত্রুটী হবে না ইন্দুর মা। আর সত্যি কথা বল্‌তে কি, আজ কাল যে সব অপোগণ্ড জন্মাতে দেখ্‌ছি তা'তে ক'রে, যা'কে তা'কে ধরে হট্ট কর্ত্তে মেয়েটাকে জলে ফেলে দিতে আমার আদৌ আগ্রহ নেই। এখন তো আর পাঁচজনের গঞ্জনার ভয় নেই ? ইন্দু ধীরেসুস্থে কিছু দিন গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করুক্, বরং পরে কাজে দেখ্‌বে।

ইন্দুর জননী চক্ষু কপালে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তারপর ?

শঙ্কর সহাস্যে কহিলেন—তারপর কেউ না থাকে, একটা হিসেব আমি মনে মনে ঠিক্ দিয়ে রেখেছি। ভগবান যদি মুখ তুলে চান্, জাতেঠেলা হ'লেও তা'তে বিশেষ আট্‌কাবে না। একঘরে আর একঘরেতে মিলে দিগ্‌গজপুরে তখন একটা চমৎকার ঘরের সৃষ্টি করা যাবে। তা তুমি দেখে নিও ইন্দুর মা !

ইন্দুর জননী কিন্তু কথাটা ঠিকমত বুঝিতে না পারিয়া অধোমুখে রহিলেন।

১১

তা সেদিন 'একঘরে' হইয়াছেন শুনিয়া শঙ্কর মুখুর্জ্জে যতই উচ্চ হাস্য করুন না কেন, তাহার জাতিচ্যুত হইবার আসল কারণটা যদি জানা থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি অতখানি আহ্লাদে আটখানা হইতে পারিতেন না। শ্রীদাম মুদীর নিকট তিনি যতটুকু শুনিয়াছিলেন ততটুকুমাত্রই তিনি জানিতেন। তদতিরিক্ত তাহার কিছুই জানা ছিল না। তারিণীর বাটীচড়াও হইবার ফলে অন্নপূর্ণার অপবাদের সহিত তাহার নিজের নামটাই যে বিশেষ করিয়া গলিত-ঘৃতের সহিত অগ্ন্যুত্তাপের দৃষ্টান্তস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তজ্জন্যই যে হারাণদের সহিত তাহাকেও সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছে ইহা অনুমান করিয়া লইবার মত উর্ব্বর মস্তিষ্ক ঐ সরল বুদ্ধি মনুষ্যটার আদৌ ছিল না। এমন কি, এই অদ্ভুত তথ্যটা শুনিবার মত সুযোগও শীঘ্র তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না।

তাহার তো গ্রামের পাঁচজনের ন্যায় গালগল্প করিবার সময় ছিল না? সকালে সন্ধ্যায় জমি জমা, জন মজুর, হাল গরু লইয়াই তাহাকে ব্যস্ত থাকিতে হয়। নিত্যনিয়মিত কর্ম্মের ফাঁকে যেদিন বা একটু অবসর ঘটে সেদিন বাগানের বেড়া কিম্বা পুষ্করিণীর তালগাছের পৈঠাটা, অথবা রন্ধনগৃহের খুঁটিটা, অন্ততঃ গোয়ালঘরের খড়ের চালখানা বাঁধিতে বা সারিতেই তাহার কাটিয়া যায়।. ইহার মধ্যে গ্রামের খুঁটিনাটীর সংবাদ লওয়া আর তাহার হইয়া উঠে না।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার ঘটনার পর হইতে প্রতিনিয়তই তিনি তারিণীদের তরফ্ হইতে এইরূপই একটা কিছু আশা করিতেছিলেন। অতএব তারিণীচালিত সমাজের উদ্যত শাষণদণ্ড যখন এইরূপে তাহার উপর আসিয়া পড়িল, তখন তিনি বরং বিস্মিত হইলেন ইহাই ভাবিয়া যে ইহা তাহাকে যতখানি আঘাত করিবে আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহার এতটুকুও সত্য নহে। পিতামাতা বহুদিন হইল ইহজগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন; অতএব পিতৃমাতৃদায় আর নাই যে পরের দ্বারস্থ হইতে হইবে; ধোপা নাপিতের তোয়াক্কা তিনি বড় একটা রাখেন না। ইন্দুর জননীই প্রায় বস্ত্রাদি পরিষ্কৃত করিয়া থাকেন; এবং আজকাল কলিকাতায় নাকি ক্ষুরও কিনিতে পাওয়া যায়। অমূল্যও আজ কয়েক দিন হইল সেখানে গিয়াছে; তাহাকে একখানা পোষ্টকার্ড লিখিয়া দিলেই চলিবে। জমিজমা তাহার নিজের। কাহারও নিকট তিনি কপর্দ্দকের জন্যও ঋণী নহেন। শুধু একমাত্র চিন্তা ইন্দুকে লইয়া। তাহার উপায়ও তিনি ইন্দুর জননীকে শুনাইয়া দিয়াছেন। ব্যস্। ভীত হইবার কি আছে?

কিন্তু শঙ্করের এই বেপরোয়া ভাবটা বেশী দিন স্থায়ী হইল না। কারণ তিনি দেখিলেন যে এতদিন তিনি নিজের কথাটাই বেশী করিয়া

চিন্তা করিয়াছেন; হারাণ দাদাদের, অনুদি'দের, তাহার স্নেহের অমূল্যদের এই ঘটনাতেই যে কতদূর বিপন্ন হইতে হইবে, তারিণীর এই হুম্‌কিটুকুই তাহাদের নিকট কি পাশবিক নির্ম্মমতার আকার ধারণ করিবে, সমাজের এই হীনতাটুকুই সেখানে যে কি করুণ দৃশ্যের অবতারণা করিবে তাহা তাহার কল্পনাতেও আসে নাই। একই ঘটনায় একজনের কিছুই হইবে না অথচ অন্যের তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইয়া যাইবে, ইহা কি শঙ্করের ন্যায় সরল, সদাপ্রফুল্ল ব্যক্তির ধারণা করা সহজ?

কিন্তু বুঝিব না বলিয়াই বা কয়টা লোক এই সংসারে অব্যাহতি পাইয়াছে? হাসিব বলিয়া কয়টা লোক হাসিতে পারিয়াছে? ভাবিব না বলিয়া কয়টা লোক চিন্তার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে?

দেনা পাওনা মিটাইতে আসিয়া হিসাবের ভুল করিয়া বসিলে হিসাব সমাপ্ত হয় না; জের বাড়িয়াই চলে; এবং অতর্কিতে একদিন সেই বহুদিনের তাচ্ছিল্যপ্রাপ্ত অঙ্কগুলাই আসিয়া এমন নির্দ্দয়ভাবে আমাদিগকে সজাগ করিয়া দিয়া যায় যে তাহার আঘাতে দুঃখের পরিবর্ত্তে প্রথমে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না।

শঙ্কর মুখুর্জ্জেরও তাহাই হইল। সেদিন তিনি সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বেই গৃহে ফিরিয়াছিলেন।

ইন্দু আসিয়া ডাকিল—বাবা।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন—কি মা?

ইন্দু বলিল—পাঁচটা টাকা।

পাঁচটা টাকা? ইন্দু চাহিতেছে! শঙ্করের মনোযোগ ঈষৎ আকৃষ্ট হইল।

কহিলেন—কে চায়?

ইন্দু বলিল—মাসীদের দরকার।

হারাণেরা তাহাদের নিকট আবশ্যক হইলে টাকা পয়সা প্রায়ই ঋণ বলিয়া লইয়া থাকেন। কিন্তু পাঁচ ছয়টা টাকা একসঙ্গে অতি অল্পদিনই চাহিয়াছেন।

শঙ্কর বলিলেন—তোমার মা'র কাছে চাওনি কেন?

ইন্দু কহিল—মা তো আপনার কাছেই পাঠালেন।

এমন সময় ইন্দুর জননী আসিয়া বলিলেন—হ্যাঁগো, আমিই পাঠিয়েছি। খুচ্‌রো টাকা আমার নেই।

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলিলেন—খুচ্‌রো না থাকে পাইকিরি ভাঙ্গাও। ইন্দুর জননী বলিলেন—কেন? পাঁচটা টাকা আর তোমার কাছে হ'লনা?

শঙ্কর হাসিয়া কহিলেন—তুমি আসা পর্য্যন্ত আমার আর অন্য সিন্দুক কোথায় দেখ্‌লে ইন্দুর মা, যে আজ আলাদা করে টাকা চাইছ?

ইন্দুর জননী বলিলেন—আলাদা করে চাইনি। আজ কোথাও কিছু পেলে কিনা জানি না বলেই ইন্দুকে পাঠালুম্।

শঙ্কর কহিলেন—কোথাও কিছুই পাইনি। যা'রা দেন্‌দার, তা'রা কি আর শোধ কর্‌বো বলে নেয়, যে চাইলেই ফিরে পাব? তুমিও যেমন! নাও, একখানা নোট্‌ই বা'র করে দাও, দাদা ভাঙ্গিয়ে নেবেন্'খন!

ইন্দুর জননী একখানি দশটাকার নোট আনিয়া ইন্দুর হাতে দিলেন। ইন্দু তাহা লইয়া প্রস্থান করিল।

শঙ্কর ডাকিলেন—বৌ!

ইন্দুর জননী বলিলেন—কি বল্‌ছ?

—ব্যাপার কি বলত?

—কিসের ব্যাপার?

—দাদার আজ এত টাকার দরকার হ'ল কেন বল্‌তে পার? বিষণ্ণস্বরে ইন্দুর জননী কহিলেন—ওঁরা যে কল্‌কাতায় যাবেন।

শঙ্কর উৎকর্ণ হইলেন—কা'রা?

ইন্দুর জননী কহিলেন—দিদিরা!

শঙ্কর আপন কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

জিজ্ঞাসা করিলেন—কা'রা?

—দিদিরা গো দিদিরা।

শঙ্কর কহিলেন—হারাণদাদারা? কল্‌কেতায় যাবেন?

ইন্দুর জননী জোর করিয়া কথাটাকে হাল্কা করিয়া লইবার নিমিত্ত কহিলেন—হাঁগো হাঁ। কানে খাঁটো হ'লে নাকি?

—নাঃ। কানে ঠিকই শুন্‌ছি ইন্দুর মা।

বলিয়া তিনি অনেকটা আপন মনেই আবৃত্তি করিলেন—দাদারা কল্‌কেতায় যাবেন।

উচ্চারিত বাক্যগুলি কর্ণে প্রবেশ করিল বটে কিন্তু শঙ্কর ভাল বুঝিতে পারিলেন না। এইতো সেদিন অমূল্য কলিকাতায় চলিয়া গেল। আবার সঙ্গে সঙ্গে দাদারাও চলিলেন! একি কথা? তাহার এতটা বয়স হইল; কৈ? সস্ত্রীক কলিকাতায় যাইতে দাদাকে তো তিনি কখনও দেখেন নাই? সমাজচ্যুত হওয়া যে গ্রামত্যাগের একটা কারণ হইতে পারে ইহা শঙ্করের মনে স্থানই পাইল না। অতএব চিন্তান্বিতভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন বল দেখি?

ইন্দুর জননী বিষণ্ণমুখে বলিলেন—কি জানি!

জানিতেন তিনি সবই। কয়েকদিন যাবৎ তাহার স্বামীকে লইয়া গ্রামে যে সকল রসাল জল্পনা চলিতেছিল, স্নানের ঘাটে সমবয়সী-দিগের বিদ্রূপাত্মক টিপ্পনী এবং পাড়ার অহৈতুকীকৃপাসিন্ধুরূপিণী

গৃহিনীদিগের অযাচিত উপদেশ হইতে তিনি ইতিপূর্ব্বে সমস্তই শুনিয়াছিলেন।

কতবড় দুঃখে ও অপমানে যে তাহার স্নেহের অনুদিদিরা আজ আজন্মের পরিচিত গ্রাম ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন তাহা আর তাহার অবিদিত নাই। কিন্তু এ সকল কথা, সন্তানের জননী হইয়া, নারীত্ব বিসর্জ্জন দিয়া কি সহজে স্বামীর নিকট ব্যক্ত করা যায়? সে যে বড় লজ্জা, বড় দুঃখের কথা!

স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত জানিয়াও আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য গোপন করিতে তিনি বাধ্য হইলেন।

শঙ্কর বিরক্ত হইয়া বলিলেন—কি জানি? বাঃ, বেশ তো? চিরকালই হাঁড়ি বেড়ির তদারক করতে জীবন গেলে আর জান্‌বে কোত্থেকে বল?

তাহার পর অনুযোগের স্বরে বলিলেন—ছিঃ বৌ, খবরটা নিতে হয়!

ক্ষুব্ধ হইয়া ইন্দুর জননী বলিলেন—তুমিই নাওনা।

সনিঃশ্বাসে শঙ্কর বলিলেন—তাই যাই। দেখি। খালি সংসার—সংসার—সংসার! আরে বৌ, সংসার কি তোমার পরকালে সাক্ষী দেবে?

বলিতে বলিতে অন্যমনে শঙ্কর বাহির হইয়া গেলেন। ইন্দুর জননী মনে মনে বলিলেন—তোমার সংসার যদি জন্মজন্মান্তরে এমনি কর্‌তে পাই, তো দেবে বই কি!

ইন্দুর জননী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা হ'ন নাই বটে; কিন্তু আপন স্বামীকে চিনিবার মত বুদ্ধিটুকু তাহার যথেষ্টই ছিল।

১২

হারাণের দরজায় গিয়া শঙ্কর ডাকিলেন—দাদা !

ভিতর হইতে হারাণ বলিলেন—কে শাঙ্খ্য ? এস, ভাই, এস, বোস। তোমার টাকাটা, ততক্ষণ ভাঙ্গিয়ে আনি।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া শঙ্কর টাকার কথা শুনিয়াই কিন্তু চটিয়া গেলেন ; বলিলেন—আমি কি আপনার কাছে টাকার তাগাদা কর্‌তেই এলুম দাদা ?

হারাণ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—না, না, সেকি ভাই ! বল্‌ছিলুম কি, সেইতো দিতেই হবে, অমনি নোটখানা—এই সময়—তুমি যখন এসেছ—

শঙ্কর অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিলেন—পুড়িয়ে ফেলুন আপনার নোট দাদা ; এখন আসল কথাটা কি খুলে বলুন দেখি !

হারাণ শঙ্করের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—কিসের কথা ভাই ?

—এই যে কলকেতায় যাবেন শুনছি ?

—তাতো যেতেই হবে শাস্খ্য।

—না গেলে কি হয় ?

—বাঁচতে হলে দুটো অন্ন তো চাই ?

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া শঙ্কর কহিলেন—মারে কে ?

শঙ্করের অজ্ঞতা দেখিয়া হারাণ মুগ্ধ হইলেন, আশ্চর্য্য হইলেন না। তিনি তাহার এই সোদরোপম মানুষটীকে বিলক্ষণই চিনিতেন। তাই ঈষদ্ধাস্য করিয়া তিনি বলিলেন—জান ত শাস্খ্য আমাদের কিসে দিন চলে ? দু'চার ঘর যজমান আর ইস্কুলের চাকরীটা ভরসা করেই এই গাঁটায় পড়ে ছিলুম। এখন সমাজের ভয়ে তারাও যখন আমায় ত্যাগ করলে তখন কল্‌কেতা ভিন্ন আর কোথায় গিয়ে দাঁড়াই বল দেখি ?

শঙ্কর বুঝিলেন। বিশেষ করিয়াই বুঝিলেন যে এই জগতে নিজের হিসাবটীই সকলের অপেক্ষা বড় হিসাব নহে। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় লজ্জিত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিয়া পরে তিনি বলিলেন—কল্‌কেতায় আপনার যে যজমানটী আছে সেও যে আপনাকে ঠাঁই দেবে তার প্রমাণ ?

হারাণ বলিলেন—প্রমাণ তো কিছুই নেই শাস্খ্য ? তবে অমূল্যও সেখানে একটা টিউসানি করে, এই যা।

শঙ্করের ক্রোধ হইল। তিনি শুধু হারাণের অন্নকষ্টের কথাটাই শুনিতেছিলেন ; যাহা সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জা ও অপমানের কথা, যে কথা শুনিলে সঙ্কোচে ও ক্ষোভে তিনি আর তিলমাত্র এই গৃহে বসিয়া থাকিবার সাহসটুকুও রক্ষা করিতে পারিতেন না, সে কথা তো তাহার কর্ণগোচর হয় নাই ; তাই অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি বলিলেন—বেশ তো যা হোক্! সে বেচারা টিউসানির টাকা ক'টায় নিজেই

সাম্‌লাতে পারে না ; তার ওপর আবার জুলুম্ কর্‌লেই বা সইবে কেন ? না দাদা—সে হয় না—

অথচ এই অবস্থায় কি করিলে যে কি উপায় হওয়া সম্ভব তাহাও নির্ণয় করিতে না পারিয়া অগত্যা নিরূপায় হইয়া শঙ্কর থামিয়া গেলেন ;

হারাণ ও একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন ; কোনও কথা কহিলেন না।

এই নিস্তব্ধতা তাহাদের চক্ষের সম্মুখে বর্ত্তমান অবস্থার গুরুত্বটুকু বেশী করিয়াই পরিস্ফুট করিয়া দিল।

শঙ্কর প্রথমে কথা কহিলেন—আচ্ছা দাদা, এ কেমন করে হয় ? মা'র পেটের ভাইতো ? সম্পর্ক তো মুছে ফেল্‌বার নয় ?

হারাণ বলিলেন—শাস্ত্র্য, পৃথিবীতে শুধু হাত দিয়ে মুছে ফেলা যায় না বলেই রক্তের সম্বন্ধটাই খুব বড় সম্বন্ধ নয়।

শঙ্কর সন্দিগ্ধস্বরে বলিলেন—সে কি দাদা ? বাপ, মা, স্বামী, স্ত্রী, ভাই, বোন, এদের চেয়ে বড়, মিষ্টি সম্বন্ধ আর কি থাকৃতে পারে ?

মৃদুহাস্য করিয়া হারাণ কহিলেন—থাক্‌তে পারে শাস্ত্র্য। আজ তোমাকে দেখেই তা বুঝতে পার্‌ছি।

শঙ্কর অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন ; পরে কহিলেন—কিন্তু আমি এখানে থেকে রোজগার কর্‌বো, সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌বো, আর আমারই বড় ভাই কল্‌কেতায় গিয়ে দুটি অন্নের জন্যে কাঙ্গালের মত দোরে দোরে ঘুরে বেড়াবে, এ কেমন করে হবে দাদা ? আপনারা চলে গেলে আমি যে সে কথা মনে করে আর মুখে অন্নই তুল্‌তে পার্‌ব না ?

হারাণের চক্ষু দুইটী জলে ভরিয়া গেল ; শঙ্করের মস্তকে নিজের দক্ষিণ হস্তখানি রক্ষা করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তিনি কহিলেন—শাস্ত্র্য, সুখী হও ভাই ; ভগবানের কাছে এমনি সুকুমার অন্তরখানা নিয়েই যেন গিয়ে

দাঁড়াতে কখন না বাঁধে। এর বেশী আর আমার কোন বড় আশীর্ব্বাদ নেই।

অবনত মস্তকে হারাণের পদধূলি লইয়া শঙ্কর উঠিয়া সহাস্যে কহিলেন—তা হ'লে এই কথাই রইল দাদা?

—কি কথা ভাই?

—এই কল্‌কাতায় যাবার বিষয়ে?

হারাণ বিস্মিত হইয়া কহিলেন—কল্‌কেতায় তো আমাদের যেতেই হবে শাব্ধ্য!

'সে কী?' বলিয়া শঙ্কর পুনরায় বসিয়া পড়িলেন।

এমন সময় একটী অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিয়া গেল। ঘাট হইতে জলপূর্ণ কলসকক্ষে অন্নপূর্ণা গৃহে প্রবেশ করিতেই, সম্মুখে শঙ্করকে দেখিয়া পথিমধ্যে সহসা উদ্যতফণাসর্পসন্দর্শনকারী ব্যক্তির ন্যায় ভীতা ও সন্ত্রস্তা হইয়া পড়িলেন এবং ত্বরিতে উঠানের উপরেই কলসীটী ধুম্ করিয়া ফেলিয়া, মস্তকের অবগুণ্ঠন দীর্ঘ করিয়া শয়নকক্ষের মধ্যে গিয়া আত্মগোপন করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় 'ঠাকুরপো' বলিয়া আর স্নেহ সম্ভাষণও করিলেন না, বা নিকটে বসিয়া পূর্ব্বের মত সহাস্যে কুশল প্রশ্নও করিলেন না।

শঙ্কর কেমন হতবুদ্ধির ন্যায় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার প্রস্থানপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার জীবনে এইমাত্র কি যেন একটা মস্ত সম্পৎ হারাইয়া গেল; এবং সেই ক্ষতিবোধের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের অন্তরখানি যুগপৎ সহস্র হাহাকারের সুরে বাজিয়া উঠিল। কেন এমন হইল? যাহার স্নেহের শ্যামচ্ছায়ায় থাকিয়া তিনি কখনও মৃতা জননী ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অভাব বোধ করেন নাই, যাহার আন্তরিক আদর যত্ন এতদিন তাহার প্রাণে সুধা বর্ষণ করিয়া আসিল,

যাহার শুভেচ্ছা এবং আশীর্ব্বাদই তাহার জীবনের একমাত্র সম্বল সেই অনুদিদির আজ একি হইল ?

উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় তিনি হারাণের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, তিনি করুণনেত্রে তাহারই মুখের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কলিকাতায় যাওয়া হউক্ আর নাই হউক্, দিগ গজপুরে যে আর তাহাদের থাকিবার কোন উপায়ই নাই একথা শঙ্কর যেন আজ নিঃশংসয়ে বুঝিলেন। তাই ব্যথিতকণ্ঠে শুধু 'আচ্ছা' বলিয়া শঙ্কর চলিয়া গেলেন।

হারাণের চক্ষু দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রাস্তায় যাইতে যাইতে শঙ্করের কেবলই মনে হইতে লাগিল, হয়ত বা এই তাহার শেষবিদায় লওয়া হইল ! হয়ত জীবনে আর তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে না ! তাহার এই স্নেহনীড় হয়তো বা আজ হইতে জন্মের মতই নষ্ট হইয়া গেল।

শঙ্করের ভিতর হইতে কে যেন নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় মাথা কুটিয়া মরিতে লাগিল।

কেন এমন হয় ? তবে কি শঙ্কর নিজেই এই সকল অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে ? কেন সে মরিতে তারিণীর বাটী ছুটিয়া গিয়াছিল। যদি গিয়াছিল তো পাষণ্ডের মাথাটাই বা গুঁড়াইয়া আসিতে পারিল না কেন ?

এইরূপ অসম্বদ্ধভাবে চিন্তা করিতে করিতে কখনও তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিলেন, কখনও দুঃখে মুহ্যমান্ হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু কোনরূপেই নিজের বুঝিবার গলদটী কোথায়, কোন্ ফাঁক দিয়া তাহার চিন্তার সূত্রটী ক্রমাগত হারাইয়া যাইতেছে তাহা তিনি ধরিতে পারিলেন না।

বাটী ফিরিয়া দাবায় বসিয়া তিনি ডাকিলেন—ইন্দুর মা—।

ইন্দুর জননী কহিলেন—কি ?

—এর মানে কি ?

—কিসের মানে ?

বলিয়া সোৎসুক নয়নে তিনি স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন।

শঙ্কর ভাবিলেন, আমি পুরুষ মানুষ হইয়া যখন ইহার অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম না তখন ইন্দুর মা'কে প্রশ্ন করা বৃথা !

কহিলেন—নাঃ। কি কাজে যাচ্ছিলে যাও।

ইন্দুর জননী ভাবিলেন—মন্দ নয় ! আজ তাঁহার হইল কি ?

মনে পড়িল, তিঁনি অনুদিদিদের ওখানে যাইবেন বলিয়াই যেন বাহির হইয়াছিলেন ; সেখানে কি তবে সব শুনিয়া আসিয়াছেন ? জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় গিয়েছিলে ?

শঙ্কর গম্ভীরস্বরে কহিলেন—কোথাও নয়।

মনটা ভাল নয় দেখিয়া ইন্দুর জননী অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। শঙ্কর সেইখানেই বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে চঞ্চলা বন্যা হরিণীর ন্যায় ক্ষিপ্রপাদক্ষেপে ইন্দু পিতার নিকট আসিয়া বলিল—এই নাও, বাবা, মেসো পাঁচ টাকা ফেরৎ দিলেন।

শঙ্কর ধমক দিয়া উঠিলেন—বড় অসভ্য তো ! যাও, মা'র কাছে যাও।

পিতার একমাত্র আদরের কন্যা এইরূপে তিরস্কৃতা হইয়া বিষন্নমুখে টাকাকয়টী লইয়া জননীর নিকট যাইতে উদ্যতা হইল।

—আর দেখ ?

ইন্দু ফিরিল।

শঙ্কর বলিলেন—তোমার মত ধিঙ্গি মেয়েরা একঘর রান্না রেঁধে পাড়াশুদ্ধ লোক খাওয়াতে পারে, জান? তুমি আজপর্য্যন্ত ক'খানা রান্না রাঁধ্‌তে শিখেছ বাপু?

ইন্দু মস্তক অবনত করিয়া রহিল।

—চুপ্‌ করে রইলে যে? রাঁধ্‌তে জান?

ভয়ে ইন্দুর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

—জাননা, কেমন? কি জান? কিচ্ছু জান না। ধাড়ি মেয়ে একটু লজ্জা করে না? যাও—

বলিয়া শঙ্কর মুখভার করিয়া গুম্‌ হইয়া বসিয়া রহিলেন। ইন্দু হঠাৎ এই তিরস্কারের কারণ বুঝিতে না পারিয়া সাশ্রুনয়নে জননীর সন্ধানে ছুটিয়া গেল।

১৩

যিনি একবার হিন্দুসমাজরূপ বঁড়্শী গলাধঃকরণ করিয়াছেন, তিনি যেখানে যতদূরে ইচ্ছা যাইতে পারেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে একটা করিয়া 'হেঁচ্কা টান' তাহাকে খাইতেই হইবে। হারাণের যে যজমানটি পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া সুদূর কলিকাতায় আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহাকেও একবার এই যোগসূত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইল। এই নিরাকার সমাজভীতি হইতে তিনিও নিষ্কৃতি পাইলেন না।

অতএব একখানি ঠিকাগাড়ী করিয়া, অপরাহ্নকালে সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় হারাণ যখন কলিকাতার ঐ যজমানটীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন গাড়ী হইতে অন্নপূর্ণাকেও আর নামিতে হইল না; গৃহকর্ত্তা সবিনয়ে নিবেদন করিলেন যে তাহারা গৃহস্থ, পুত্রকন্যা লইয়া ঘর করেন; হারাণের উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি থাকিলেও তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া সমাজ ত্যাগ করিতে তিনি অপরাগ।

সরলার্থ হইল, আশ্রয় মিলিবে না।

গাড়ীর ভিতর হইতে অন্নপূর্ণা সব শুনিতে পাইলেন। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে হারাণ গাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া বলিলেন—তাইতো অন্নু, এখন উপায় ?

অন্নপূর্ণা কহিলেন—এসো, বল্‌ছি।

হারাণ গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—আমারই বুদ্ধির দোষ অন্নু। সকলেই যখন ত্যাগ করলে তখন কোন ভরসায় বা আমি এতদূর থেকে এদের কাছে ছুটে এলাম ?

গাড়োয়ান হাঁকিল—আবি কাঁহা যানা পড়েগা বাবু ?

অন্নপূর্ণার চক্ষে জল আসিল। তিনি বলিলেন—বেশ করেছ, এসেছ। গাঁয়ে কি আর একদণ্ডও তিষ্ঠিবার উপায় ছিল ?

হারাণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—তা'তো ছিল না। কিন্তু এখন যে রাস্তায় দাঁড়াতে হয় ?

অন্নপূর্ণা শতবার আপনাকে ধিক্কার দিলেন। তাহারই জন্য না হারাণের আজ এত বিপদ! নিজে অলক্ষণা, কালামুখী তাই নিরপরাধ দেবতুল্য স্বামীকে পদে পদে এইরূপ লাঞ্ছিত, নিগৃহীত হইতে হইতেছে।

গাড়োয়ান বলিল—রাস্তামে চুপ্‌ চাপ্‌ খাড়া রহ্‌নেসে সর্‌কার্‌ পাক্‌ড়েগা বাবু।

হারাণ বলিলেন—মৃজাপুরে চলত বাপু।

অন্নপূর্ণা চমকিয়া উঠিলেন—এ্যা ? অমূল্যর মেসে ?

হারাণ বলিলেন—আর যাবইবা কোথায় ? গাঁয়ে ফেরবার ভাড়াও নেই, ভাড়া থাক্‌লেও গিয়ে ফল নেই।

—কিন্তু অমূল্য আমাদের নিয়ে কি করে' কি কর্‌বে ? তার ওপর যদি আবার শোনে যে—

বাকীটুকু ওষ্ঠে আসিল না।

হারাণ বলিলেন—আমাদের দুর্বিপাকের কথা আমাদেরই তার কাছে গোপন কর্‌তে হবে। তার কানে এসব গেলে তো আরও বিপদ্ অন্নু!

গাড়ী চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে হারাণ পুনরায় বলিলেন—ভেবো না অন্নু। ভগবান মাথার ওপরে আছেন।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—ভগবানের বিচারের কথা আর বলো না। আমি না হয় জন্মঅভাগী, কিন্তু আমার জন্যে তোমার যে এত বিড়ম্বনা এ তো সহ্য হয় না? সারাদিন এই পথের কষ্ট, মাথায় একফোঁটা জল পড়েনি, তা'র ওপর এই উপোষ। কেন বল তো? তোমার কি অপরাধ?

হারাণ একটু হাস্যের বিফলচেষ্টা করিয়া বলিলেন—ভগবানের বিচার তো তোমার আমার মনের মত হয় না? দোষের কথা বল্‌ছ অন্নু? তোমার দোষ কি? স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করা, তাকে সুখী করা, তো স্বামীর ধর্ম্ম? তা'র কতটা আমি পেরেছি?

অন্নপূর্ণা হারাণের মুখে হাত দিয়া বলিলেন—চুপ্ কর। চুপ্ কর। তোমার মত স্বামী কতজন্মের তপস্যায় লোকে পায়, তা জান?

জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গাড়ি আসিয়া মৃজাপুরের মেসে থামিতেই সম্মুখের ঘর হইতে একজন বলিয়া উঠিল—এখানে নয়, এখানে নয়, এটা মেস্‌বাড়ী।

হারাণ গাড়ি হইতে নামিয়া যুবকটীকে বলিলেন—আমি এই মেস্‌বাড়ীতেই এসেছি।

যুবকটী দেখিল বক্সার সঙ্গে খড়খড়ীবন্ধ গাড়ী। অথচ মেস্‌বাড়ীতেই এসেছেন! কিছুক্ষণ হারাণের মুখের প্রতি হতবুদ্ধির মত

চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে সে বলিল—তবে দাঁড়ান্। ম্যানেজার ম'শায়কে ডেকে দিই।

কিছুক্ষণপরে ম্যানেজার মহাশয় আসিয়া ক্ষুদ্র একটী নমস্কার করিয়া বলিলেন—কা'কে চান্ আপনি?

হারাণ বলিলেন—অমূল্য চরণ চট্টোপাধ্যায়।

—আপনি কোথা থেকে আস্‌ছেন?

—দিগ্‌গজপুর থেকে। আমি তা'র পিতা। গাড়ীতে তা'র গর্ভধারিণী। অনুগ্রহ করে তা'কে যদি ডেকে দেন্।

—তাইতো! অমূল্যবাবু তো কাল এখান থেকে চলে গেছেন?

হারাণ মাথায় হাত দিয়া রোয়াকের উপরই বসিয়া পড়িলেন; দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত মুখ হইতে বাহির হইল—নারায়ণ!

ম্যানেজার মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কয়েকজন বোর্ডার আসিয়া সব শুনিতেছিল। এক্ষণে তাহাদের মধ্য হইতে হৃষ্টপুষ্ট, শ্যামবর্ণ, একটী যুবক হারাণের বিপদ কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার নিকট আসিয়া বলিল—দেখুন, আমি তা'র সহপাঠি, বন্ধু। একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে অমূল্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়ে কাল সকালেই তা'র জিনিষ-পত্র নিয়ে চলে গিয়েছে। আপনি উঠুন্। আমি তা'র ঠিকানা জানি।

যুবকটীর নাম শ্রী সুধীর মিত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথমবৃত্তিপ্রাপ্ত অতিমেধাবী গ্রাজুয়েট; সম্প্রতি এম, এ পড়িতেছে। একসঙ্গে কলেজে পড়িয়া ও মেসে থাকিয়া অমূল্যর সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্টতা ও বন্ধুত্ব ঘটিয়াছে। উভয়ে এক কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই মেসে আসিয়া উঠিয়াছিল।

মজ্জমান্ ব্যক্তি নিকটে ভাসমান্ কাষ্ঠখণ্ড দেখিলে যেমন আশান্বিত

হইয়া উঠে, সেইরূপ হারাণ পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুধীরের হাতদুইটী ধরিয়া বলিলেন—বাবা, দয়া করে যদি নিয়ে যাও।

সুধীর অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—ওকি বল্‌ছেন? আমি আপনার পুত্রতুল্য। আমায় অপরাধী কর্‌বেন না।

সুধীর কোচ-বক্সে উঠিতে যাইতেছিল; কিন্তু হারাণ গাড়ীর দরজা খুলিয়া তাহাকে ভিতরে আসিতে বলিলেন। সে আসিয়া অন্নপূর্ণার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। অন্নপূর্ণা তাহার চিবুকস্পর্শ করিয়া বলিলেন, এসো. বাবা, এসো।

তিনজনে গাড়ীতে বসিলে কোচম্যান গাড়ী ছুটাইল।

১৪

বড়রাস্তার উপর শ্যামধনপুরের জমীদার শ্রীনরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাণ্ডবাটীর বাহিরের বৈঠকখানায় সন্ধ্যাবেলা অমূল্য একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালককে পড়াইতেছিল। এমন সময় তাহার সহপাঠী সুধীর আসিয়া ডাকিল—অমূল্য।

অমূল্য সুধীরকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। গতকল্য সে মেস্‌ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। ইহারই মধ্যে সুধীরের আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বলিল—কি খবর সুধীর?

সুধীর অমূল্যর নিকটতম অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে অমূল্যর অবস্থা হইতে তাহার বাটীর ব্যাপার অনেক কিছুই জানিত। সেইজন্য বলিল—খবর খুব মনের মত নাও হ'তে পারে।

অমূল্য বলিল—আমাদের অদৃষ্টে সেইটাই স্বাভাবিক। যাক্। বোস। কি হয়েছে বল।

সুধীর বসিবার আদৌ আগ্রহ না দেখাইয়া বলিল—হ'বে আর কি? হ'বার মধ্যে তোমার বাবা আর মাঠাকুরুণ বাইরে গাড়িতে র'য়েছেন।

অমূল্য হাতের পুস্তক ফেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

—সেকি?

সুধীর মেসের ঘটনা সমস্তই বলিল। অমূল্য ভাবিয়া পাইল না যে এমন কি ব্যাপার ঘটিয়াছে যে যাহার জন্য চিঠি পর্য্যন্ত না দিয়া হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহারা এখনে আসিলেন। মনে পড়িল, তাহার কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বদিন, শঙ্করমেসো তারিনী জ্যেঠার বাটী গিয়া এক কাণ্ড করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সহিত ইঁহাদের কলিকাতায় চলিয়া আসিবার কি কারণ থাকিতে পারে? তবে কি জ্যেষ্ঠতাত তাহাদের নূতন কিছু ভীষণতর বিপদে ফেলিবার উদ্যোগ করিয়াছেন?

সুধীর বলিল—ওহে, চিন্তাটা এখন মুল্‌তুবী থাক্‌। তাঁ'রা গাড়িতে রয়েছেন। চল।

অমূল্য নিরুপায় হইয়া বলিল—এখন আমি কি করি ভাই? এইতো কাল এঁদের এখানে এসেছি। নূতন টিউসান; তাঁদের কোথায় আনি? অমূল্যর ছাত্রটী উঠিয়া চলিয়া গেল।

সুধীরও সারারাস্তা তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে। পথে আসিতে আসিতে কথায়বার্ত্তায় সে এইটুকু বুঝিয়া লইয়াছে যে তাঁহারা দেশ ত্যাগ করিয়াই কলিকাতায় আসিয়াছেন। বিশেষ কোনও কিছু না ঘটিলে উঁহারা যে এইভাবে আসিয়া পড়িবেন, তাহা তো মনে হয় না? কিন্তু স্থানই বা কোথায় যে উঁহাদের রাখা যায়? হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, অমূল্য যে যজমানটীর বাটীতে থাকিয়া কিছুদিন পড়িয়াছিল, তাহার ওখানে তো—? সে বলিল—অমূল্য তুই যা'র বাড়ি থেকে পড়েছিলি শুনি?

অমূল্য মাথা নাড়িয়া বলিল—না রে সুধীর সে আশা নেই।

—কেন ?

—বাবা কি সেখান থেকে না হ'য়ে একেবারে আমার সন্ধানে এখানে ছুটে এসেছেন ?

—কিন্তু আর তো বিলম্ব করা চলে না ? ত্তাঁরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে। চল, সকলে মিলে একটা যা হয় কর্‌তেই তো হ'বে ?

'তাই চল' বলিয়া অমূল্য বন্ধুটীর সহিত বাহিরে হইয়া আসিয়া দেখিল, গাড়ীর নিকটে তাহার পিতা মূর্ত্তিমান্ বিষাদের মত দণ্ডায়মান্। অমূল্যকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—বাবা অমূল্য !

উদ্গত অশ্রু চাপিতে গিয়া ধরাগলায় শেষের কথাকয়টা তাহার আর বুঝা গেল না। অমূল্য তাহাকে প্রণাম করিয়া গাড়ীর ভিতর হইতে জননীর পদধূলি লইল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—অমূল্য, বিশেষ দায়ে না পড়্‌লে আমরা এভাবে একবস্ত্রে কল্‌কাতায় এসে উঠ্‌তুম্ না। যার আশায় এসেছিলুম তা'র ওখানেও তো সুবিধা হ'ল না। আজ রাতটার মত এখন কোথায় যাই বল্ দেখি ?

অমূল্য বলিল—আজ রাতটার মত কেন মা ? যখন এসেছ, তখন তো আর ফির্‌ব বলে আসনি ?

অন্নপূর্ণা চোখের জল মুছিলেন। গাড়ির ভিতরের অন্ধকারে অমূল্য তাহা দেখিতে পাইল না।

সুধীর নিকটে আসিয়া বলিল—এঁদের তো আর গাড়ীতে রাখা চলে না ? বরং এঁদের বাইরের ঘরেই কিছুক্ষণ রেখে চল, একখানা ঘর যদি পাই, তাড়াতাড়ি ভাড়া করে ফেলি।

অমূল্য উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিল—সে কি ঠিক হবে ?

সুধীর বলিল—না হ'লে উপায় কি অমূল্য ?

এমন সময়ে ভিতর হইতে অমূল্যর ছাত্রটির সহিত একটী গৌরাঙ্গী কিশোরী আসিয়া অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিল। অন্নপূর্ণা ব্যস্তসমস্তা হইয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মেয়েটী বলিল—আমার সঙ্গে ভিতরে আসুন্।

বলিয়া অন্নপূর্ণার হাতখানি ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া তাহাকে লইয়া যাইবার সময়ে অমূল্যর প্রতি দীপ্তিব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, হারাণকে দেখাইয়া বলিল—ততক্ষণ ওঁকে আপনার ঘরে নিয়ে যান্।

অমূল্য মুগ্ধ হইয়া গেল। ভাবিল, ইহাও কি জগতে সম্ভব ?

১৫

হারাণেরা যাওয়া অবধি শঙ্কর দুইবেলা ভাল করিয়া আহার করেন নাই ; ইন্দুর জননীর সহিত ভাল করিয়া দুইটা কথা কহেন নাই ; সময়ে অসময়ে অযথা ইন্দুকে তিরস্কার করিয়াছেন ; রাত্রিটা দাবায় শুইয়া কাটাইয়াছেন ; ইন্দুর জননী ডাকিলে রাগিয়া জবাবটা পর্য্যন্ত দেন নাই।

সেই শঙ্কর যখন আজ সকালে ইন্দুর হাত ধরিয়া হাস্যমুখে রন্ধনশালার সম্মুখে আসিয়া 'ইন্দুর মা' বলিয়া ডাকিলেন, তখন ইন্দুর জননী সত্যই আজ কাহার মুখ দেখিয়া শয্যাত্যাগ করিয়াছেন তাহা স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

শঙ্কর বলিলেন—আমি তো তাই বলি, অত ভাবনা কিসের? মানুষের হাতে কোন্‌টা আছে? ভগবান যেটীর পরে যা' কর্‌বার ঠিক্ ক'রে ক'রে যাচ্ছেন ; মাঝখান্ থেকে ভেবে মর্‌ছি, শুধু তুমি আর আমি।

ইন্দুর জননী চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন।

শঙ্কর আপনমনে বলিতে লাগিলেন—ইন্দুর মা, অনুদি'দের জন্যে তুমি তো ভেবেই সারা। বলে, মোটে পাঁচটা টাকা হাতে ক'রে কল্‌কাতার মত সহরে চলে গেলেন? আরে গেলেন্ তো গেলেন্! ভাবনা কেন, তাই শুনি?

'ভাবনা'টা যে কাহার অধিক ইন্দুর জননী তাহা বিলক্ষণই জানিতেন। সেইজন্য বলিলেন—কিছু খবর পেলে নাকি?

শঙ্কর বলিলেন—পাবো না? আমি যাচ্ছিলুম হারানদাদাদের যা'তে না যাওয়া হয়, তাই কর্‌তে। এখন দেখ, কল্‌কাতায় যেতেই না এই সুবিধেটা হ'ল?

ইন্দুর জননী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি সুবিধেটা হ'ল?

শঙ্কর বলিলেন—জমীদারের বাড়ী। প্রকাণ্ড বাড়ী! ঝি, চাকর, ঠাকুর, দারোয়ান্, গাড়ী, ঘোড়া, কি নেই? থাক্‌বার মধ্যে কর্ত্তা, তাঁর এক ছেলে, আর এক মেয়ে। অমূল্যর মুখে কতক কতক দুঃখের কথা শুনে তাঁরা কল্লেন দাদাকেই একরকম বাড়ীর সর্ব্বেসর্ব্বা। হিসেব পত্তর রাখা বল, আয়ব্যয় দেখা বল, সব হারাণদা'র হাতে। এ পোড়া গাঁয়ে দাদার কদর কেউ বুঝ্‌লে না বলে কি আর জগতে মানুষ নেই, না ধর্ম্ম নেই? ভাগ্যে অমূল্যর ওখানে ছেলেপড়ানটা জুটেছিল! সব ভগবানের হাত বুঝ্‌লে ইন্দুর মা?

ইন্দুর জননী স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সত্যই হারাণেরা দেশত্যাগ করিবার দিন হইতে তাহারও চিন্তার অবধি ছিল না। এক্ষণে স্বামীর মুখে তাহাদের একটা কিনারা হইয়াছে শুনিয়া তাহার অনেকখানি দুর্ভাবনা দূর হইল। দুর্ভাবনা দূর হইল বটে, কিন্তু

তারিণীদের বিশ্বাস নাই। স্বামীটী যেরূপ ভোলানাথ, এই আনন্দের খবরটী না পাঁচজনকে দিয়া বসেন। তাই সাবধান করিয়া দেওয়া আবশ্যক বিবেচনায় ইন্দুর জননী বলিলেন— দেখ, ভোলারা যেন এ সব খবর আবার না পায়। যদি তাঁ'রা দু'দিনও সুখের মুখ দেখ্‌তে পেয়ে থাকেন তা হ'লে তা'ও তাঁদের ভাগ্যে টিক্‌বে না।

শঙ্কর জিহ্বা দংশন করিয়া বলিলেন—আমাকে তেমনি মুখ্যুই পেলে কি না! অমন পাষণ্ডদের শয়তানেও কি বিশ্বাস করে ইন্দুর মা?

ইন্দু দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল। এক্ষণে সে বলিল—বাবা, একদিন কল্‌কেতায় যাবে?

সহাস্যে শঙ্কর তাহার কুঞ্চিত কেশরাশি যত্নপূর্ব্বক বিন্যাস করিতে করিতে বলিলেন—কল্‌কেতায় কোথায় যাবি মা?

"যাও" বলিয়া ইন্দু পিতার বক্ষে মুখ লুকাইল।

শঙ্কর ইন্দুর মস্তকটী সযত্নে বক্ষের উপর রাখিয়া ভারিগলায় বলিলেন—তাঁরা যে আমাদের কাছে থাকেন, এতো কেউ দেখ্‌তে পারে না মা? তাইতো তাঁরা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন্!

ইন্দু বলিল—মাসীরা কি আর আস্‌বে না বাবা?

শঙ্করের চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন—তা'তো জানি না মা?

ইন্দু পিতার নিকট হইতে সহসা পলাইয়া গেল। তাহার জননী বলিলেন—দেখ, ইন্দু আর তেমন খেলা করে না; দিনরাত মুখখানি ভার করে বেড়ায়। আমি বলি কি, আস্‌ছে হপ্তায় ওকে একবার না হয় দেখিয়ে নিয়ে এসো। দিনরাত ওদের বাড়িতেই তো থাক্‌তো?

শঙ্কর বলিলেন—তাই না হয় একদিন যাই। আর দেখ ইন্দুর মা, ওঁরা যে আমাদের এতটা আপনার ছিলেন্ তা কে জান্‌ত? কাল হাট

থেকে আসবার সময় ওদের খালি বাড়ীটার দিকে চোখ তুলে চাইতেই পারলুম না। ওদিকটা যেন খাঁ খাঁ করছে। তাই ভাবি, এখন থেকে এতখানি গাঁ'টায় আমরাই একা পড়্লুম!

বলিতে বলিতে শঙ্কর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। এমন সময়ে ক্ষেতের মজুরগণ জলখাবার লইতে আসিল। ইন্দুর জননীকে তাহাদের জলপানি দিতে বলিয়া শঙ্কর মাঠে চলিয়া গেলেন।

এদিকে ইন্দু জামগাছতলায় গিয়া জাম কুড়াইতে লাগিল। আঁচলখানি যখন ভরিয়া উঠিল তখন বাড়ীতে আসিয়া সে রোয়াকে বসিল; তাহারপর জামগুলি লইয়া একটী একটী করিয়া তুইটী ভাগ করিয়া অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিল। অবশেষে সমস্ত জামগুলি ছড়াইয়া ফেলিয়া ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

জননী ডাকিলেন—ইন্দি, চান্ কর্‌বিনে?

—না।

—না কিরে? আয়, মাথাটায় একটু তেল দিয়ে দি।

ইন্দু 'না' বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

তাহার জননী তখন এক কৌশল করিয়া বিচিত্র নগরী কলিকাতার গল্প ফাঁদিলেন। ইন্দু উঠিয়া জননীর কাছটিতে আসিয়া বসিল। সুযোগ বুঝিয়া তিনিও তাহার মাথায় সাদরে তৈল মাখাইতে লাগিলেন।

১৬

ঠিক সর্ব্বেসর্ব্বা না হইলেও নরেন্দ্র নারায়ণ নিরীহ হারাণের ব্যবহারে ক্রমে এত প্রীত হইলেন, তাহার সরলতায় এতখানি মুগ্ধ হইলেন, যে স্বগৃহের সমস্ত দায়িত্বের ভার একে একে হারাণের হস্তে অর্পণ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে তিনি কতকটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। অমূল্য পিতার দেশত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বের কারণ না জানিলেও, পিতার উপর আপন জ্যেষ্ঠতাত তারিণী চট্টোপাধ্যায়ের আজীবনের অমানুষিক নিষ্ঠুরতার কাহিনী, আপনাদের সংসারের দুরবস্থার বিবরণ এবং শঙ্কর মেসোর অমায়িক আত্মীয়তার পরিচয়সকল একটী একটী করিয়া নরেন্দ্রনারায়ণের নিকট বিবৃত করিয়াছিল। যতই দিন যাইতে লাগিল নরেন্দ্রনারায়ণ হারাণের আচরণে ততই মুগ্ধ হইলেন এবং সাশ্চর্য্যে ভাবিতে লাগিলেন যে তারিণীর হৃদয় পাষাণের অপেক্ষাও কঠিন কিনা; সে মানুষ হইয়াই যদি জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে ঈশ্বরের রাজ্যে পশু এবং মানুষের ব্যবধানরেখা কোথায়?

অল্পদিনের মধ্যেই অমূল্যর সহিত হারাণ এবং অন্নপূর্ণা জমীদার-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেলেন। সকলের আপত্তি নামঞ্জুর করিয়া অন্নপূর্ণা যেদিন রন্ধনশালার ভার আপন হস্তে গ্রহণ করিলেন, সেদিন বাটীর দাসদাসী হইতে জমীদারের আই-এ পরীক্ষোত্তীর্ণা বিদুষী কন্যা বিদ্যুৎবালা পর্য্যন্ত অবাক্ না হইয়া পারিল না।

সে বলিল—কাকিমা, এ আপনার কি অন্যায় ?

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন—অন্যায় কি মা ? আমরা যদি ঠাকুরের হাতে রন্ধনশালার ভার তুলে দি, তাহ'লে তার চেয়ে বড়কলঙ্কের কথা স্ত্রীলোকের আর কি আছে ?

—তাহলেও, এত পরিশ্রম আপনার সইবে কেন ?

—এতো পরিশ্রম নয় মা, এ যে আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম। তা' ছাড়া আমি জন্মদুঃখিনী। দেশেঘরে এর চেয়ে কম পরিশ্রম তো আমি কোনদিন করিনি।

বিদ্যুৎবালা ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া বলিল—আচ্ছা, আপনি না হয় খুব পরিশ্রমই করতেন। কিন্তু এতে যে আমাদের অপরাধী হতে হয় ?

—তোমাদের অপরাধী করবার স্পর্দ্ধা আমার কোথায় ? তোমাদের অপরাধ ? ভগবানেরও অপরাধ হতে পারে কিন্তু তোমাদের তা' হতে পারে না। বরং আমি থাকতে ঠাকুর বামুনের হাতে খেয়ে তোমাদের এই সোনার শরীরে যদি কালি লাগে তা'তে আমারই অপরাধ হবে যে মা ?

বিদ্যুৎ হাসিয়া ফেলিল। বলিল—কই, এতদিন তো কালি লাগেনি ?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—কি জানি মা। আমি যাদের আপনার বলে মনে করি, তাদের নিজের হাতে না খাওয়ালে কেমন যেন তৃপ্তি হয় না।

শুনিয়া বিদ্যুতের মন আজ যেন নারীর মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিল।

নারীজাতীর প্রকৃত সৌন্দর্য্য কোথায়, আজ অন্নপূর্ণার কথায় বিদ্যুৎ যেন তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। জননীর কথা স্বপ্নের মত মনে পড়ে; বুঝিবা পড়েও না। কিন্তু অন্নপূর্ণা এ বাটীতে আসা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ প্রতিনিয়ত এই মাতৃসমা নারীর স্নেহের পরশ লাভ করিয়া নিজের জননীর অভাব ভুলিতে বসিয়াছে। অন্নপূর্ণার সান্নিধ্য লাভ করিয়া সত্যই তাহার হৃদয় পুলকে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার স্নেহমমতার শীতল অঞ্চলতলে সে যেন এতদিন পরে জীবনের সজীবতা লাভ করিয়াছে। স্কুলের ও কলেজের পাঠ মুখস্ত করিয়া, গল্পের বই ও মাসিক পত্রিকা পড়িয়া, কনিষ্ঠ কনকের উপর অপটু গৃহিনীপনার দ্বারা ইচ্ছামত সে দিন গুলিকে কাটাইয়া দিতেছিল। এক্ষণে অন্নপূর্ণার সতর্ক পাহারায় যতই তাহার দৈনন্দিন জীবন সুনিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল ততই সে সংসারের অন্তঃস্থলের গোপন মধুরতাটুকুর আস্বাদ লাভ করিয়া যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সেদিন রাত্রে হারাণের সঙ্গে নরেন্দ্র নারায়ণ বাবু আহার করিতে করিতে বলিলেন—বৌমা, গিন্নী স্বর্গে যাওয়া থেকে এমন অমৃত কপালে আর যে বড় জুটেছে বলে তো মনে পড়ে না।

হারাণ ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তো এতবড় জমীদারের সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে প্রথম প্রথম খুবই অনিচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু নরেন্দ্র বাবু, তিনি না বসিলে আহার করিবেন না দেখিয়া তাঁহার অনুরোধই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। না করিয়াই বা করেন কি? জমীদার তাহাকে কনিষ্ঠের ন্যায় স্নেহ করেন। তাঁহার কথা কি অমান্য করা যায়?

বিদ্যুৎ পিতাকে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। দূরে দরজার পার্শ্বে অন্নপূর্ণা থালা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নরেন্দ্র বাবু বলিলেন—জান্‌লে ভায়া, কনক তখন বছরতিন আর এই বিদ্যুৎ তখন সাত বছরেরটী; গিন্নী স্বর্গে গেলেন। তখন থেকে আহার্য্যের স্বাদ একরকম ভুলেই গিয়েছি বল্‌লেই হয়।

অন্নপূর্ণা দুধের বাটী আনিয়া থালার পার্শ্বে রাখিলেন। নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—দেখো মা, বুড়ো ছেলেটার ভার যখন একান্তই নিলে তখন আর তা নামাতে পাবে না।

অন্তরালে অন্নপূর্ণা অশ্রুমোচন করিলেন, কতকটা এই বৃদ্ধের প্রতি সমবেদনায় এবং কতকটা নিজেদের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া।

নরেন্দ্র বাবু বলিলেন—আচ্ছা ভায়া, অমূল্যচরণ তো বিকালে ল'কলেজে যায়, সারা দুপুরটা থাকে কোথায়?

মুখের গ্রাসটা তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করিয়া হারাণ বলিলেন—আফিসে আফিসে চাক্‌রীর চেষ্টায় ঘোরে। সে বলে যখন এঁদের এতখানি দয়া পেয়েছি তখন সময়টাকে নষ্ট করা হবে না।

—বড় ভাল ছেলে, বড় বুদ্ধিমান ছেলে। আহা! কত কষ্টই এই ছেলেবয়সে সে পেয়েছে। আচ্ছা, চাকরী চাকরী ক'রে না ঘুরে, যে দিনকাল পড়েছে ঘুরেও তো বিশেষ সুবিধা হ'বে বলে বোধ হয় না; কেমন না?

—আজ্ঞে তাইতো শুনি। তবে চেষ্টাও তো করা চাই?

—তা করে করুক্। আমি বলি কি, এখন তার খরচ কি? বরং এম এ টা যদি পড়্‌তে চায়, এই সঙ্গে ভর্ত্তি হয়ে যাক্ না?

হারাণ শিহরিয়া উঠিলেন।—স্বপ্ন নয় তো?

—চুপ্ করে রইলে যে হে? দুটো বছর বইতো নয়? ও পাশটা কল্লে, আমারই উপকার বুঝ্‌লে না? কনক যত পড়ে পড়ুক্ না? অমূল্য রইলো তা'র শিক্ষার জন্য; আর আমায় ভাব্‌তে হবে না।

বিদ্যুৎ বলিল—সেই ভাল বাবা।

বলিয়াই সে যেন কেমন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। এখানে এ কথাটা না বলিলেই যেন ভাল হইত। এই আগ্রহের মধ্যে তাহার কোথায় কি যেন একটু লজ্জার কারণ রহিয়া গেল। সে ভাবিল, কেন? অন্যায় কি? এমন কি লোকের জন্য লোকে বলে না? অমন রূপবান্, গুণবান্, কষ্টসহিষ্ণু! অথচ অর্থের জন্য পড়া হইবে না?

। আসলকথা, বিদ্যুৎ পিতার কাছে কখন কোনও মনের কথা বলিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। তাই আজ অভ্যাসমত আপন ইচ্ছা বলিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে কণামাত্র সঙ্কোচও তাহাকে স্পর্শ করিবে তাহা সে পূর্ব্বে কল্পনাও করে নাই।

পিতা কন্যাকে বলিলেন—সেই ভাল, কেমন মা?

পরে হারাণের প্রতি চাহিয়া কহিলেন—বুঝ্‌লে হে, এটি দেখ্‌তে এইটুকু, কিন্তু করেন আমার মন্ত্রীর কাজ।

শেষে আচমন করিতে করিতে বলিলেন—তাহ'লে ওই কথাই রইল। আজ এলে, তা'ই বোলো। কাল থেকেই ভর্ত্তি হয়ে যাক্। ছেলে মানুষ অত কষ্ট সইবে কেন?

হারাণ বলিলেন—আমি মূর্খ। আপনি তার যতটা ভাল বুঝ্‌বেন তার ওপর আমার আর কি বল্‌বার আছে?

বেশ তাহ'লে এই ঠিক রইল। বলিয়া নরেন্দ্র বাবু গাত্রোত্থান করিলেন।

১৭

এ বাটীতে অমূল্য প্রতিপদক্ষেপেই কাহার যেন একটা সযত্ন পাহারা অনুভব করিতে লাগিল। প্রত্যূষে উঠিয়া আপনার পাঠ প্রস্তুত করিয়া কনককে পড়াইতে পড়াইতে বেলা কোথা দিয়া বাড়িয়া যায় তাহা তাহার নিজের হুঁশ্ থাকে না। কিন্তু বাটীর ভৃত্য বংশী ঠিক সময়মত স্নানের তাগিদ দিয়া যায়। "যাচ্চি" বলিয়া পুনরায় পুস্তকের পাতা উল্টাইতে যাইলে সে শুনে "দিদিমণি রাগ কর্‌ছেন।" অগত্যা উঠিতে হয়। আহারান্তে সে দেখে, জুতাজোড়াটি ব্রুশের স্পর্শে তক্‌তক্ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। কলেজে লইয়া যাইবার পুস্তকগুলি, খাতা কয়খানি, এমন কি পেন্‌সিলটী পর্য্যন্ত টেবিলের উপর সাজান রহিয়াছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় হাতমুখ প্রক্ষালন করিয়া আপনার ঘরটীতে প্রবেশ করিয়াই, সে দেখে একখানি রেকাবিতে কাহার সুপটুহস্তে সজ্জিত, সৌখীন করিয়া কর্ত্তিতখানকতক ফলের টুক্‌রা, দুইএকটী মিষ্ট, একবাটী ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, এক গ্লাস জল তাহারই অপেক্ষায় রহিয়াছে।

রাত্রিতে আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম হইবার উপায় নাই। তাহা হইলে অন্তঃপুর হইতে বিদ্যুতের মৃদুতিরস্কারমিশ্রিত ঘন ঘন আহ্বান আসিতে থাকে। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িতে থাকিলে তাহার শত অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া বংশী বাতি নিভাইয়া দিয়া যায়। জিজ্ঞাসা করিলে বলে—দিদিমণির হুকুম।

ক্রমশঃ নিজের সত্ত্বা বলিয়া যে একটা কিছু আছে, এখানে থাকিতে থাকিতে অমূল্যর তাহা যেন ভুলিয়া যাইবারই উপক্রম হইল। প্রথম প্রথম দুইচারিদিন অমূল্য ভাবিয়াছিল, ইহা বড়লোকের মেয়ের খেয়াল। দুইদিন হইয়াছে, দুইদিন পরেই চলিয়া যাইবে। সে বিশ্বাসই করিতে পারে নাই যে তাহার মত দরিদ্রের উপর এই সকল অযাচিত যত্নের মূলে সত্যকার কিছু ভিত্তি থাকিতে পারে। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল ততই অমূল্য সাশ্চর্য্যে উপলব্ধি করিল যে আর যাহাই হউক ইহাকে ঠিক খেয়াল নামে অভিহিত করা যায় না।

সত্যই এক একদিন তাহার রাগ হইত। ভাবিত, কি বিড়ম্বনাতেই পড়িয়াছি!

কনককে পড়াইবার পর যেটুকু সময় অবশিষ্ট থাকিত এম, এ এবং আইন পাঠের পক্ষে সেটুকু তাহার যথেষ্ট বলিয়া মনে হইত না। অথচ একটু অতিরিক্ত সময় পাঠে ব্যয় করিতে গেলেই হুকুম আসিত—আর পড়া হইবে না। রাত্রি জাগিলে শরীর নষ্ট হয়।

কাজেই পুস্তক বন্ধ করিতে হয়।

আবার এই সকল বাঁধাধরা আইন, কানুন, হুকুমের ফাঁকে ফাঁকে অন্তঃপুর হইতে এমন এক একটা উদ্ভট্ বায়না আসিত যে অমূল্য মধ্যে মধ্যে বিশেষ বিব্রত হইয়াই পড়িত। হয়ত সে কনককে পড়াইতেছে, বংশী আসিয়া একটুক্‌রা পশম দিয়া বলিল—এই যে রংটা দেখ্‌ছেন বাবু,

এর চেয়ে একটু ফিঁকে হবে, বুঝ্‌লেন্? সরকার রং চেনে না। পড়ানটা রেখে শীগ্‌গির যান।

সেদিন রং মিলিয়ে পশম আনিতেই বেলা হইয়া গেল। অথচ আহার না করিয়া বাটীর বাহির হইবার উপায় নাই। আহারাদি করিতে সাড়ে বারটা বাজিয়া গেল। হুকুম আসিল, আজ আর দুপুরে কলেজে যাইতে হইবে না। বিকালে ল'ক্লাশে গেলেই চল্‌বে'খন।

অমূল্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল।

অন্নপূর্ণা মনে মনে বিদ্যুতের বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন।

একদিন পুস্তকাদি লইয়া অমূল্য বাহির হইতেছে, ছুটিতে ছুটিতে বংশী আসিয়া হাজির। হাতে তাহার একখানি ছিন্নচিত্র।

সে বলিল—বাবু, এই যে ময়ূরটা দেখ্‌ছেন, গাছের ডালে মুখ ঝুলিয়ে বসে আছে, এ হ'লে চল্‌বে না। বসে থাকে থাক্, কিন্তু মাথার ঝুঁটীশুদ্ধ মুখ্‌টা আকাশের দিকে তুলে থাকা চাই। আকাশে মেঘ না থাকে, দিদিমণি করে নেবেন্ এখন। আর পেখম্‌টা কিন্তু খুলে থাক্‌বে, বুঝ্‌লেন্? কলেজ থেকে ফের্‌বার সময় কিনে আন্‌বেন্!

বলিয়া অমূল্যর হাতে টাকা দিল।

কলেজের ছুটির পর ময়ূরের চিত্র সন্ধান করিয়া বাটী ফিরিতে তাহার রাত্রি হইয়া গেল। পড়াশুনাও সেদিন রাত্রে ঐ পর্য্যন্তই হইল।

রাত্রে নরেন্দ্র বাবু হারাণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—অমূল্য আজ কোথা গেছ্‌ল হে ভায়া?

হারাণ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বিদ্যুৎ বলিল—একটা ছবি কিন্‌তে দিয়েছিলুম, বাবা।

—কেন মা, সরকার মশাইকে তো দিলেই পার্‌তে?

—সরকার ম'শায়ের ভীমরথী ধরেছে বাবা। আন্‌তে দেব হরিণ,

এনে বস্‌বেন কুকুর। বল্‌লে বল্‌বেন, বাজারে যে সব হরিণের ছবি, তা'র চেয়ে এ কুকুরটা দেখ্‌তে ঢের ভাল।

বিদ্যুতের বলিবার ভঙ্গীতে সকলেই হাসিয়া ফেলিলেন। অন্নপূর্ণাও অন্তরালে দাঁড়াইয়া মৃদুহাস্য করিলেন।

নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—তা সরকার ম'শাই না পারেন, একটা ছুটির দিন, কি রবিবার দেখে অমূল্যকে দিলেই তো হোত মা?

—হ্যাঁ। আর আমি এই চারদিন ধরে শুধু নেট্ হাতে করে বসে থাকি কিনা।

—কিন্তু মা, অমূল্যর কতখানি কষ্ট হ'ল বল দেখি?

বিদ্যুৎ, অমূল্য প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর হইতেই সে কথা বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়াছেও কম নয়। পিতার নিকট সেটুকু শুধু গোপন করিবার প্রয়াস পাইতেছিল মাত্র। এক্ষণে লজ্জিতা হইয়া মুখ নীচু করিয়া ধীরে ধীরে সে বলিল—এত দেরি হবে আগে বুঝ্‌তে পারিনি বাবা।

হারাণ বলিলেন—এর জন্যে মা'কে আমার অত লজ্জা কেন দিচ্ছেন বলুন্ দেখি? হ'লই বা একটু রাত? আর এমন রাতই বা কি হয়েছে? কল্‌কেতায় ন'টা সাড়ে ন'টায় তো সন্ধ্যা।

নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—না হে ভায়া। তুমি সাধাসিধে মানুষ, বুঝ্‌ছ না। শুধু কি অমূল্যর কষ্টের জন্যেই বল্‌ছি? কল্‌কাতা সহর জায়গা ভাল নয়, বুঝ্‌লে?

হারাণ চুপ্ করিয়া রহিলেন।

রাত্রে অন্নপূর্ণা শয়ন করিতে যাইবার সময় হারাণকে বলিলেন—দেখ, বিদ্যুতকে আমি পেটেই ধরিনি, নয়তো নিজের মেয়ে হ'লেও যে এর চেয়ে তার ওপর বেশী মায়া পড়্‌তো, তা'তো মনে হয় না।

হারাণ বলিলেন—অনু, কিছুদিন আগে গাড়ীতে বসে ভগবানের বিচারে দোষ ধরেছিলে না ? এখন বল দেখি, দোষ কি সত্যই তাঁর ? না আমাদের বোঝ্‌বার ভুল ?

—মানুষ যার বড় ভরসা করে, বিপদে পড়্‌লে তাকেই দেয় দোষ। এই যে মানুষের স্বভাব ?

—তাহ'লে যাঁর বড় বেশী ভরসা কর, এখন তাঁর কাছে নিজের দোষ জানিয়ে ক্ষমা চাও অনু !

অন্নপূর্ণা হারাণের পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

১৮

বিদ্যুতের কিন্তু অমূল্য লোকটীকে লাগিত বেশ। এতখানি বাটীর মধ্যে এতদিন এক কনিষ্ঠ কনক ব্যতিত অন্য দ্বিতীয় ব্যক্তিটী এমন ছিল না যাহাকে সে নিজের ইচ্ছামত চালিত করিতে পারিত বা ইচ্ছা করিলে একটু যত্নও করিতে বাঁধিত না। ঐ যে একটী লোক দূরে দূরে থাকিয়া দিবারাত্র তাহারই ইঙ্গিতে চলাফেরা করিতেছে ইহা সে যতই অনুভব করিতে লাগিল ততই সে পুলকিত অন্তঃকরণে অমূল্যর প্রত্যেক কার্য্যেই আপনার সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে লাগিল। তাই সকাল সন্ধ্যায় যেমন সে অন্নপূর্ণার সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরিয়া গৃহস্থালীতে মনোনিবেশ করিত, তেমনি দুপুরবেলা অমূল্যর অনুপস্থিতিতে তাহার পড়িবার ঘরের টেবিলটী সাজান, ছবিটী ঝুলান, কলমের নিবটী ধুইয়া রাখা, পুস্তকগুলির থাক্ দেওয়া, পেন্সিলটী কাটিয়া রাখা, অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলি ফেলিয়া দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যে আপনাকে নিয়োগ করিত।

অমূল্য প্রাতঃকালে খড়ির সাহায্যেই দন্তমার্জ্জনা করিত। বিদ্যুৎ একদিন এককৌটা টুথপাউডার ও একটী ব্রাস্ বংশীর হাত দিয়া পাঠাইল।

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল—ও আবার কি?

বংশী বলিল—বুরুস্ আর দাঁতের মাজন। আজ থেকে এই দিয়েই মুখ ধোবেন। দিদিমণি বল্‌লেন, এতে দাঁত খুব ভাল পরিষ্কার হয়।

অমূল্য প্রত্যেক ব্যাপারেই বংশীর দিদিমণিটীর হুকুমের আভাষ পাইয়া আর কোন কিছুতেই প্রতিবাদ করিবার সাহস পায় না। অতএব লইল।

স্নানান্তে কেশপ্রসাধন করা অমূল্যর কোন দিনই অভ্যাস ছিল না। এখানে আসিয়া তাহাও হইল। একদিন স্নানের পর সে দেখিল, বংশীর হাতে চিরুণী, ব্রাস্ ও আয়না। প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না; কি জানি, বংশীর দিদিমণিটী তো লোক সোজা নহেন্! সবেতেই তাঁহার কড়া হুকুম।

আসল কথাটা হইল, অমূল্য বিদ্যুৎকে পূর্ব্বহইতেই সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিয়া আসিত। সেইদিনকার কথা সে আজও ভুলিতে পারে নাই। সুধীর এবং সে, যেদিন রাস্তায় দাঁড়াইয়া পিতামাতার একটু আশ্রয়চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিল, বিদ্যুতের তখনকার সেই সুধামাখাকণ্ঠের অভয়বাণী, দীপ্তিব্যঞ্জক দৃষ্টি, সেই করুণার মূর্ত্তিখানি অমূল্যর হৃদয়ে চিরদিনের মত গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। সেইদিন হইতে যতবারই তাহার বিদ্যুতের কথা মনে হইয়াছে ততবারই তাহার হৃদয় শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়িয়াছে।

একদিন বিদ্যুতের অজ্ঞাতসারে কনক তাহার বুনিবার নেট্‌খানা লইয়া আসিল। অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল—হাতে ওখানা কি?

কনক বলিল—সেই যে সেদিন আপনি ময়ূরের ছবি কিনে আন্‌লেন না মাষ্টার মশাই? তাই দেখে দেখে দিদি কেমন এঁকেছে দেখুন।

অমূল্য দেখিল সত্যই অতি চমৎকার হইয়াছে; বিদ্যুতের নিপুণহস্তে চিত্রখানিতে যেন রংয়ের খেলা লাগিয়াছে। আকাশে ঘোর ঘনঘটা; ভারে ভারে মেঘ নিম্নে নামিয়া আসিতেছে; তাহা দেখিয়া ময়ূরের আনন্দ তাহার নৃত্যে যেন ভাষা দান করিতেছে।

কনক জিজ্ঞসা করিল—কেমন হয়েছে মাষ্টার মশাই? শিগ্‌গির বলুন্। এখানে এনেছি টের পেলে, দিদি আর রক্ষে রাখবে না।

অমূল্য হাসিয়া বলিল—ভারি সুন্দর হয়েছে কনক।

'দেখলেন্ তো? দিদি কেমন বুন্‌তে পারে?' বলিয়া কনক চিত্রখানি লইয়া পলাইয়া গেল। অমূল্য পেন্‌সিল হাতে করিয়া অন্যমনস্কভাবে কাগজে দাগ কাটিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে শুভ্র কাগজের পৃষ্ঠায় একটী ময়ূব নাচিয়া উঠিল, আকাশে মেঘের উপর মেঘ জমিতে লাগিল এবং তাহাদের বুক চিরিয়া একটী বিদ্যুৎ ঝক্‌মকিয়া উঠিল। ময়ূরের পায়ের তলায় অমূল্য তাহার নামের আদ্যক্ষর তিনটী যথারীতি ইংরাজীতে লিখিল। অঙ্কনবিদ্যায় সে একটু পারদর্শীই ছিল।

কনকের হস্ত হইতে ছবিখানি কাড়িয়া লইয়া বিদ্যুৎ বলিল—এখানা নিয়ে সাততাড়াতাড়ি কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

ভয়ে সত্যকথা গোপন করিয়া কনক বলিল—কোথায় যাব আবার?

ধমক্ দিয়া বিদ্যুৎ বলিল—কথ্‌খনো এ সবে হাত দেবে না, দুষ্ট ছেলে!

কনক পলাইয়া গেল।

অমূল্য কলেজে চলিয়া গেলে, দুপুর বেলায় যথানিয়মে পড়িবার ঘর

গুছাইতে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে বিদ্যুতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, মেঝের উপর উড়িয়াপড়া পেন্‌সিলে আঁকা একখানি চিত্র। বিদ্যুৎ সেখানি তুলিয়া লইয়া নিবিষ্টমনে দেখিতে লাগিল। শিল্পীর নামটাও তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

কনকের কথা মনে পড়িয়া গেল। কি দুষ্ট ছেলে! এ তাহারই কাজ। সে নেট্‌খানি লইয়া নিশ্চয়ই অমূল্যকে দেখাইয়া গিয়াছে। আচ্ছা, হচ্ছে তার! ইস্কুল থেকে আসুক্ একবার!

ছবিখানি সে ব্লাউসের বুকে গুঁজিয়া রাখিয়া নির্দ্ধারিত কার্য্য সারিয়া চলিয়া গেল।

আপনার ঘরে গিয়া বিদ্যুৎ নিজহাতে বোনা নেট্‌খানি দেখিতে লাগিল। তাহারপর সেখানি রাখিয়া সদ্যপ্রাপ্ত চিত্রখানি খুলিয়া বসিল। সে যতই দেখিতে লাগিল ততই যেন তড়িতের আলোকে সমস্ত চিত্রখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল; কোথাকার কোন্ অজানা আলোকময় রাজ্যের এতটুকু চমক্ লাগিয়াই মেঘের ঘনঘটা যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও ময়ূরের নৃত্য অধিক নয়নরঞ্জন হইয়াছে। সত্যইতো! তাহার নিজের অঙ্কনের কি ভ্রমই না আজ তাহার চক্ষে ধরা পড়িল?

ময়ূরের পদতলে অমূল্যর নামের সাক্ষর দেখিয়া বিদ্যুতের গণ্ডস্থল ঈষৎ রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে ছবিখানি বাক্সের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। পরে ভাবিল, ছি! ছি! আমার মন কি সন্দিহান্। এও কি সম্ভব? অমূল্যবাবু কিরূপে জানিবেন যে এই চিত্রখানি আমারই হাতে আসিয়া পড়িবে? ছিল তো ধূলায় পড়িয়া? চিত্রের মধ্যে অমূল্যর ইঙ্গিতের কল্পনা করিয়া বিদ্যুৎ যে লজ্জা পাইয়াছিল তাহা যে অমূলক, সেটুকু বুঝিতে তাহার এতটুকুও বিলম্ব হইল না।

১৯

তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। কলেজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জলযোগ সমাপনান্তে অমূল্য সবেমাত্র কনককে লইয়া পড়িতে বসিবার উদ্যোগ করিতেছে। এমন সময় বামহস্তে ক্যাম্বিসের ব্যাগ, বগলে একটী ছাতা ও লাঠী এবং দক্ষিণহস্তে ইন্দুবালার হাত ধরিয়া শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত।

অমূল্য শশব্যস্ত হইয়া শঙ্করের পায়ের ধূলা লইল এবং ইন্দু প্রণাম করিতে আসিতেই তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া হাস্যোজ্জ্বলমুখে শঙ্করকে বলিল—এসেছেন? বসুন্। পরশুদিন আপনার চিঠি পাওয়া থেকে আমরা একরকম রাস্তার দিকে চেয়ে বসে আছি।

তক্তাপোষের উপর ব্যাগ, ছাতা প্রভৃতি রাখিয়া শঙ্কর বলিলেন—গয়লা বৌকে তো জানিস্ অমূল্য? তা'র আর সময় হয় না। ইন্দুর মা'কে তো আর একলা রেখে আস্তে পারি না? বলে ক'য়ে তা'কেই তোর মাসীর কাছে রেখে তবে এলুম্।

অমূল্য বলিল—আপনি ততক্ষণ বসুন, আমি ইন্দিকে মা'র কাছে নিয়ে যাই।

বলিয়া আনন্দের আতিশয্যে তাহাকে একরূপ টানিতে টানিতেই রন্ধনশালায় অন্নপূর্ণার নিকট লইয়া চলিল।

অন্নপূর্ণা রাত্রের জন্য লুচি ভাজিতেছিলেন এবং বিদ্যুৎ নিকটে বসিয়া সেগুলি বেলিয়া দিতেছিল।

অমূল্য আসিয়া বলিল—এই দেখ মা! কে এসেছে!

অন্নপূর্ণা ঝটিতি ঘৃতের কড়াটি উনুন হইতে নামাইয়া রাখিয়া ইন্দুকে একেবারে ক্রোড়ের মধ্যে লইয়া বলিলেন—মা বিদ্যুৎ, এই আমার সেই ইন্দু!

এই সেই ইন্দু? যাহার কথা অন্নপূর্ণার মুখে সে সংখ্যাধিকবার শুনিয়াছে? এখানে যাহার স্থান বিদ্যুৎই পূরণ করিয়াছে? বিদ্যুৎ ভাল করিয়া দেখিল, মেয়েটী তাহার অপেক্ষা দুই এক বৎসরের কনিষ্ঠা। তাহাকে একবার দেখিলে সহসা দৃষ্টি ফিরাইয়া লওয়া যায় না। সুন্দরী তো অনেকেই আছে; সে দেখিয়াছেও অনেক। কিন্তু এই মেয়েটীর চক্ষুদুইটীতে কি যেন একটী অপরূপ কিছু আছে, যাহার জন্য তাহাকে সুন্দরী তো বলিতেই হয়, উপরন্তু মনে হয় যে, যাহার প্রতি এই মেয়েটী একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবে তাহাকে মুহূর্ত্তে আপনার করতলগত করিয়া লইতে ইহার বিলম্ব হইবে না।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—কেমন আছ মা?

ইন্দু মধ্যে মধ্যে সন্তর্পনের সহিত বিদ্যুতের অজ্ঞাতসারে বিদ্যুৎকে দেখিয়া লইতেছিল; বলিল—ভাল আছি।

—তোমার মা, বাবা?

অমূল্য বলিল—মেসো তো এসেছেন্!

ইন্দু বলিল—তুমি কেমন আছ মাসি ?

—আমরা ভাল আছি। তুমি এত রোগা হ'য়ে গেছ কেন মা ? অসুখ করেনি ত ?

অমূল্য এতক্ষণ তাহা লক্ষ করে নাই। সে দেখিল, সত্যই ইন্দুর চিরস্বভাবগত চপলতার স্থলে গাম্ভীর্য্য আসিয়াছে ; শরীর শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইন্দু যেন আর সে ইন্দু নাই। এই এক বৎসরের মধ্যে তাহার এত পরিবর্ত্তন ! অমূল্য বিস্ময় অনুভব করিল।

অন্নপূর্ণার প্রশ্নে ইন্দুর চক্ষুদুইটী ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। ইন্দুর যে রূপ বলিয়া একটা বস্তু আছে, এতদিন অমূল্য তাহা লক্ষ করে নাই। আজ যেন হঠাৎ তাহার মনে হইল—ইন্দু বড় রূপসী !

অমূল্য দেখিল, তাহার আগমনে বিদ্যুৎ একটু সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িয়াছে। সে আর এখানে বেশীক্ষণ থাকা সঙ্গত মনে করিল না ; বলিল—মা, মেসো একলা আছেন, আমি যাই।

বলিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—ইন্দু, তোমার দিদিকে প্রণাম কর ; ওঁরই দয়ায় আমরা এখানে আশ্রয় পেয়েছি।

বিদ্যুৎ ঈষৎ লজ্জিতা হইল। ইন্দু তাহাকে প্রণাম করিল বটে, কিন্তু খুব প্রসন্নমনে নয়। সে দেখিয়া লইয়াছে, বিদ্যুতের রূপ আছে। হইতে পারে উহাদের অনুকম্পাতেই মাসীরা আশ্রয় লাভ করিয়াছেন ; তাহাতে তাহার কি যায় আসে ? মাসীদের উহারা উপকার করিয়াছে সত্য, কিন্তু ইন্দুর তাহাতে লাভের পরিবর্ত্তে ক্ষতিই হইয়াছে সমধিক। দেশে কিসব গোলমালের জন্য যে তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া পড়িয়াছেন তাহা সে সম্পূর্ণ জানেও না, বা বিশেষ বুঝেও নাই। সে এইটুকু উপলব্ধি করিয়াছে মাত্র যে তাঁহাদের না আসিয়া গত্যন্তর ছিল

না। তবে ইহাও ঠিক যে উহাদের এই কৃপাটুকু না পাইলেও চলিত। শুধু চলিত না; তাহা হইলে অমূল্য পূর্ব্বের মতই তাহাদের নিকটে থাকিত। এ এক কোথাকার মায়াবী দয়ার অভিনয় করিয়া তাহার প্রিয়পাত্রদের তাহার নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতেছে?

বিদ্যুৎ আসিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিল—এস ভাই, কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধোবে এস।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—যাও মা ইন্দু, এতদূর থেকে আস্‌তে তোমার কত কষ্টই হয়েছে। তোমার দিদির সঙ্গে যাও।

ইন্দু কিছু বলিল না। অগত্যা বিদ্যুৎকে অনুসরণ করিতে হইল।

২০

অমূল্য বহির্ব্বাটীতে যাইতেছিল, মধ্যপথে ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে জানাইল যে কর্ত্তা তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন। অমূল্য তৎক্ষণাৎ কর্ত্তার নিকট গেল।

নরেন্দ্র বাবু তখন বৈঠকখানায় বসিয়া গড়গড়ার নল মুখে দিয়া দেওয়ানের সহিত কথা কহিতেছিলেন। অমূল্যকে দেখিয়া বলিলেন—তোমার সেই শঙ্কর মেসো এসেছেন ?

পড়াইতে বসিয়া অমূল্য উঠিয়া যাইলে কনক আসিয়া পিতাকে এই সংবাদটী দিয়া গিয়াছিল।

অমূল্য বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কই আমার সঙ্গে দেখা কর্‌লে না ?

—আজ্ঞে, খবর দিচ্ছি।

—খবর দিচ্ছি কিহে ? এখনও খবর দাও নি ?

—তিনি অল্পক্ষণই এসেছেন।

—তা এলেই বা? বলি আমার সঙ্গে তো আগে দেখা করতে হয়?

অমূল্য চুপ্ করিয়া রহিল।

—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও?

অমূল্য অগ্রসর হইল।

—দেখ, জল্‌টল্ খাইয়ে পাঠিয়ে দিও।

—যে আজ্ঞে।

অমূল্য আসিয়া দেখিল, শঙ্কর মেসোর আহ্নিক, জলযোগাদি হইয়া গিয়াছে; পিতার সহিত বসিয়া তিনি আলাপ করিতেছেন। সে বলিল—বাবা, কর্ত্তা মেসোকে দেখ্‌তে চাইছেন।

হারাণ শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন—কর্ত্তা মানে? জমীদার নরেন্দ্র বাবু নাকি দাদা?

হারাণ বলিলেন—হ্যাঁ। এস, দেবতুল্য লোক।

—তা'তো জানি, কিন্তু চাষাভূষো লোক আমি। তাঁর সঙ্গে কি কথা বল্‌তে কি কথা বলে অভ্রমে পড়্‌ব দাদা তাই ভাব্‌ছি।

—আমি তোমার দাদা; তিনি আমার দাদা। কোন ভয় নেই শাড্ডু, এস।

'চলুন্' বলিয়া হারাণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শঙ্কর বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি দেখিলেন, নরেন্দ্র বাবুর পঞ্চাশ পঞ্চান্নর কাছাকাছি বয়স। ধব্‌ধব্ করিতেছে শরীরের বর্ণ। দিব্য নধর কান্তি। মাথার কেশগুলি একেবারে শুভ্র হইয়া গিয়াছে। একটি তাকিয়া হেলান দিয়া গড়গড়ার নল মুখে লইয়া বসিয়া আছেন।

শঙ্কর গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ঐ দীর্ঘাকার বিপুলকায়

ব্যক্তিটী প্রণাম করিতেই নরেন্দ্র বাবু বলিয়া উঠিলেন—হয়েছে, হয়েছে। বস।

উভয়ে বসিলেন।

—হাঁ, আবার বলে রাখি। হারাণ আমার কনিষ্ঠতুল্য, তুমি শুনেছি হারাণকে দাদা বল। আমি যে তোমায় 'আপনি' 'আজ্ঞে' বল্‌তে পারবো, তা' মনে করোনা?

এতবড় ধনী ব্যক্তিকে এইভাবের কথা বলিতে দেখিয়া শঙ্কর তাজ্জব্ হইয়া গেলেন। ভাবিলেন—দাদার কথাই ঠিক।

নরেন্দ্র বাবু বলিলেন—কিহে? চুপ্ করে রইলে যে? কথাটা পছন্দ হ'ল না?

থতমত খাইয়া শঙ্কর বলিলেন—সে কি কথা? আমার মত দরিদ্র, পাড়াগাঁয়ের মূর্খকে আপনি যদি কনিষ্ঠের মত দেখেন, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য!

—ব্যস্! ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও। জলযোগ করেছ?

—আপনার বাটীতে এসে অভুক্ত থাক্‌বার কি উপায় আছে?

—আছে। বৌমা প্রত্যহ প্রাতঃকালীন আহারটা বেলা তিনটা পর্য্যন্ত মুলতুবী রেখে থাকেন। যাক্। তা'হলে জলযোগ হয়েছে?

—আজ্ঞে হাঁ।

—তোমার প্রশংসা অমূল্যর কাছে অনেক শুনেছি। এই ভায়াটীও তোমার নাম কর্‌তে তো অজ্ঞান। ইচ্ছা ছিল, তোমার সঙ্গে আলাপ কর্‌ব। এসে পড়েছ, ভালই হয়েছে। এখন দু'চারদিন থাকা হচ্ছে তো?

শঙ্কর আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন—বাড়ীতে তো কেউ নেই—?

নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—বেশ। বেশ। তালা বন্ধ করে এসেছ তো?

—অমূল্যর মাসী বাড়ীতেই আছেন।

—কে? বৌমা?

—আজ্ঞে।

—সে কি হে? একলা?

—একটী ঝিকে বাড়িতে রেখে এসেছি।

—কেন? সঙ্গে করে আন্‌লেই পারতে তো বাপু?

—আমার তো বেশীদিন বাইরে থাকবার উপায় নেই? আমাকে না দেখ্‌লেই চাষীরা ফাঁকি দেবে।

"তা দেবে বৈকি" বলিয়া নরেন্দ্রবাবু নলটা টানিতে লাগিলেন।

—দাদার চিঠিতে আপনার মহৎ হৃদয়ের কথা,আপনার কন্যার গুণের কথা অনেক পড়েছি; আজ কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা কয়ে আর এখান থেকে নড়্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছেনা। ইন্দুও যে মা'কে ফেলে বেশীদিন থাকতে পারবে না, নয়তো—

বাধা দিয়া নরেন্দ্রবাবু বলিয়া উঠিলেন—ইন্দু? তোমার মেয়ে না?

—আজ্ঞে।

—আবার বলে আজ্ঞে। কই এতক্ষণ তো বলনি বাপু? তা'কে রেখে এলে কোথায়? ডাক, একবার দেখি? ওরে—ও নূতন ঝি—

তেওয়ারি গিয়া বংশীকে খবর দিল; বংশী নূতন ঝিকে বলিল; নূতন-ঝি আসিয়া উপস্থিত হইল।

নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—ইন্দুকে ডেকে আন্।

সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ইন্দুকে তো সে দেখে নাই!

নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে? ইন্দু রে! এই বাবুটীর মেয়ে; এইমাত্র এসেছে—।

নূতন-ঝি চলিয়া গেল।

নরেন্দ্রবাবু হারাণকে বলিলেন—কিহে হারাণ, ভাইটী কি এখানে দু'দিনও থাকবে না?

হারাণ বলিলেন—বাড়িতে তো ওর একটীও পুরুষ মানুষ নেই, নয়তো ওকি আপনার কথা ফেল্‌তে পারে?

শঙ্কর বলিলেন—কালই যাব মনে করেছিলুম; কিন্তু আপনার কথা অমান্য করবার তো আমার সাধ্য নেই? আপনি যেদিন বল্‌বেন সেইদিনই যাব।

খুসী হইয়া নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—সেই ভাল। যতদিন না 'যাও' বল্‌ছি, ততদিন তো থাক?

বলিয়া তিনি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। হারাণ এবং শঙ্করও হাসিতে লাগিলেন।

আপনার একখানি ফিরোজা রংএর শাড়ী পরাইয়া বিদ্যুৎ ইন্দুকে সঙ্গে লইয়া আসিল। ইন্দু নরেন্দ্রবাবুকে প্রণাম করিল। ইন্দুকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—বাঃ, দিব্যি মেয়ে তো! এসো মা, আমার কাছে বস।

ইন্দু তাঁহার নিকটে বসিল। বিদ্যুৎ, পিতা, হারাণ ও শঙ্করকে প্রণাম করিল। নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—তোমার নামটী কি মা?

—শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী।

—বটে! মা বিদ্যুৎ, খাতা পেন্‌সিল্‌টা নাওতো? একটা প্রোগ্রাম্ করে ফেল। দু'দিনের মধ্যে কল্‌কেতার যা কিছু দেখে ফেল্‌তে হবে। তোমার কাকাটী ঘোড়ায় জিন্ দিয়ে এসেছেন। নাও—!

বিদ্যুৎ প্রোগ্রাম্ করিতে বসিয়া গেল। নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—দেখ ভায়া, অমূল্যর কিন্তু এ দু'দিন আর কলেজে গেলে চল্‌বে না। বলে দিও, বুঝ্‌লে?

হারাণ সম্মতি জানাইলেন। নরেন্দ্রবাবুর এই অহঙ্কারশূন্য অমায়িকতায় এবং সুমধুর স্নেহের ব্যবহারে শঙ্করের হৃদয় জুড়াইয়া গেল।

২১

প্রথমদিনেই দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী, কালীঘাট ও মিউজিয়ম্ দেখা হইয়া গেল। মা কালীর কাছে ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিয়া ইন্দু একান্তভাবে প্রার্থনা করিল, যেন অমূল্যদের শীঘ্র শীঘ্র আবার দিগ্‌গজপুরে ফিরিয়া যাওয়া হয়। মিউজিয়মের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্ত্তিগুলি দেখিতে তাহার মন্দ লাগিল না। তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল বিভিন্ন প্রদেশের প্রস্তর ও মৃন্ময় মূর্ত্তিগুলি। সে এমনও বলিয়াছিল, যে সেই বড় বড় পুতুলগুলি পাইলে তাহাদের এরূপভাবে সে সাজাইতে পারে, যে কেহ তাহা কল্পনাও করে নাই। ইন্দু ভাবিয়া পাইল না যে একটা হলঘরে অত কাপড় জামা থাকিতে মানুষের মত অত বড় বড় পুতুলগুলিকে কেন অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় রাখা হইয়াছে।

দ্বিতীয় দিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখিয়া সকলে বোটানিকেল্ গার্ডেনে উপস্থিত হইলেন। ষ্টিমারযাত্রাটুকু ইন্দু বেশ উপভোগ

করিয়াছিল। কিন্তু গার্ডেনটী দেখা হইলে, সে সবিস্ময়ে অমূল্যকে প্রশ্ন করিয়াছিল যে তাহাদের দেশে তো এমন বাগান অনেকই আছে, কিন্তু কলিকাতা হইতে কেহ তো গাড়ীভাড়া করিয়া তাহা দেখিতে যায় না? ইহাতে অমূল্য যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহা যে রীতিমত সদুত্তর ইহা সে একবাক্যে মানিয়া লইতে পারে নাই; বরং তাহার কথায় বিদ্যুতের হাস্য দেখিয়া ইন্দু বিশেষ চটিয়াই উঠিয়াছিল।

তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে নরেন্দ্র বাবু শঙ্করকে বুঝাইলেন যে যদিও সবই একরূপ দেখা হইল, তথাপি চিড়িয়াখানা না দেখিয়া গেলে কলিকাতার একরূপ কিছুই দেখা হইল না। অতএব আহারাদির পর সেদিন দুইখানি মোটরে করিয়া সকলে চিড়িয়াখানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

অল্পক্ষণ ঘুরিবার পরই নরেন্দ্র বাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে একখানি বেঞ্চে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—জমি নিলুম্ হে ভায়া। না পার তোমরাও বসে পড়। কতকগুলা জন্তু জানোয়ার বই ত নয়? দেখ্‌বার আর কি আছে?

তাঁহার প্রাতঃকালের কথা স্মরণ করিয়া শঙ্কর হাসিয়া ফেলিলেন। নরেন্দ্র বাবু তাহা দেখিয়া নিজের যুক্তির পোষকতা করা হইল অনুমান করিয়া বলিলেন—কেমন না? বস, বস। ওহে অমূল্য, তুমিই সব দেখিয়ে আন। আমাদের এই পর্য্যন্ত।

হারাণ ও শঙ্কর, নরেন্দ্র বাবুর পার্শ্বে বসিলেন। এখানে বিদ্যুৎ বহুবার আসিয়াছে; অতএব সে অন্নপূর্ণার সহিত অগ্রগামী হইল। পশ্চাতে ইন্দুকে লইয়া অমূল্য চলিল, কি অমূল্যকে লইয়া ইন্দু চলিল বুঝা শক্ত; যেহেতু এই দুইদিনই পর্য্যটনকালে ইন্দু ছায়ার ন্যায়

অমূল্যর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়াছে; বাটীর বাহিরে সে তাহাকে বিদ্যুতের সহিত দুইটা কথা কহিবারও অবসর দেয় নাই; বিদ্যুতের কাছাকাছি হইলেই, মানুষ দেখিলে ব্যাঘ্রী যেমন তাহার শাবকটীকে মুখে করিয়া পলাইয়া যায়, সে ছুটিয়া আসিয়া সেইরূপ অমূল্যকে একরূপ ছিনাইয়া লইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে। বিদ্যুৎ যে ইহা লক্ষ্য করে নাই তাহা নহে; তাই সে যতদূর সম্ভব অমূল্যকে দূরে দূরে রাখিয়া চলিতেছিল। সে অন্নপূর্ণার সহিত যখন একটু বেশী অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে তখন অমূল্য অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—ঐ দেখ্ ইন্দু, কত সারস পাখী!

ইন্দু অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। পরে বলিল—এতগুলা সুন্দর সুন্দর সারস কোথা থেকে এল, অমূল্যদা?

অমূল্য বলিল—এরা পুষে রেখেছে।

—পুষে রেখেছে? বাঃ বাঃ!

—নে—চল্। এমনি করে দেখ্‌লে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। ওদিকে বাঘ দেখ্‌বি চল্।

চলিতে চলিতে ইন্দু বলিল—আচ্ছা অমূল্যদা, আমাদের জন্যে এখানে তোমার মন কেমন করে না?

অমূল্য বলিল—তা আর করে না রে?

—তবে চল না কেন?

—আর তা হয় না ইন্দু।

ইন্দু ভয়ানক রাগিয়া গেল। তাহাদের দেশে ফিরিয়া যাইবার কি যে এমন অন্তরায় আছে, তাহা সে ভাল বুঝিতেও পারে না, ঠিক জানেও না; জিজ্ঞাসা করিলেও কেহ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াও দেয় না; অথচ এই একজায়গা আছে যেখানে তাহার প্রশ্ন সকলের

নিকট হইতেই বারংবার ওই একই উত্তরের আঘাতে ফিরিয়া আসিয়াছে—তা আর হয় না।

সে বলিল—হয় না—হয় না! কেন হয় না? জ্যেঠাদের সঙ্গে ঝগড়া কি আজ নূতন? এতদিন থাকৃতে পারলে, আর আজই ফিরে যাওয়া হয় না? তোমরা সব—

ইন্দু আর বলিতে পারিল না। তাহার চক্ষে অশ্রু আসিয়া পড়িল।

ইন্দু এখন আর নিতান্ত বালিকা নয়; তাই তাহার এই প্রশ্নকে অমূল্য সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। কারণ সে নিজেও বহুবার চেষ্টাসত্ত্বেও বুঝিতে পারে নাই যে হঠাৎ এমন কি গুরুতর কারণ ঘটিল যে তাহার পিতামাতা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া উঠিলেন। অবশ্য ইহাতে তারিণীজ্যেঠার যে সম্পর্ক আছে তাহা সে পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু তাহা কিরূপে?

ইন্দুর চক্ষে জল দেখিয়া অমূল্য বিস্মিতও হইল। সে তাহার হাতখানি ধরিয়া ডাকিল—ইন্দু!

অমূল্যর মুখের উপর তাহার জলভরা দৃষ্টি রাখিয়া ইন্দু উত্তর দিল—কি অমূল্যদা'?

ব্যথাভরা কণ্ঠে অমূল্য বলিল—কাঁদ্‌ছিস্?

ইন্দু মুখ নীচু করিল।

অমূল্য বলিল—এক কাজ কর্‌বি? আমাদের কাছে থাক্‌বি?

ইন্দু মস্তক আন্দোলন দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিল। দেখিয়া অমূল্যর মনে হইল, যেন বহুদূর হইতে কে তখন আর্ত্তকণ্ঠে তাহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে।

সে বলিল—থাক্‌তে পার্‌বি?

ইন্দু তাড়াতাড়ি বামহস্তে চক্ষের জল মুছিল; তাহার হৃদয়

আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। যেন বর্ষার পর সমগ্র প্রকৃতি রবির কিরণে আনন্দোজ্জ্বল হইল।

হাসিমুখে ইন্দু বলিল—খুব পারব। দেশে তো আমি দিনরাত্তির মাসির কাছেই থাকতুম ?

কিন্তু থাকা তাহার হইল না। শুধু অমূল্যর ইচ্ছা নহে, নরেন্দ্র বাবুও, বিদ্যুতের সমবয়সী দেখিয়া ইন্দুকে কিছুদিন কলিকাতায় রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দুর জননীর সাতটী নাই, পাঁচটী নাই। ওই একটি মাত্র কন্যা ; ইন্দু পারিলেও, তাহার জননী, কন্যাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইলে, কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইবেন শুনিয়া নরেন্দ্র বাবু আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। অতএব পরদিবস সকলকে প্রণাম করিয়া শঙ্কর দেশে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় ইন্দু আসিয়া অমূল্যকে প্রণাম করিল। প্রণামকালে অমূল্যর পায়ে তাহার একফোঁটা চোখের জল পড়িল।

ইন্দুকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে অমূল্য বলিল—কাঁদিস্‌নি ইন্দু, আবার আস্‌বি।

ইন্দু আর কিছু বলিতে পারিল না। পিতার সহিত চলিয়া গেল। তাহারা দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেলেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অমূল্যর কিন্তু মনে হইতে লাগিল, দূর হইতে ইন্দু যেন ক্ষীণকণ্ঠে বলিতেছে—পারলে না অমূল্যদা' ? আমায় রাখ্‌তে পারলে না ?

২২

ইন্দু চলিয়া যাইবার পর হইতে বিদ্যুতের ব্যবহারে কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হইল। প্রায় দুইবৎসর অতীত হইতে চলিল অমূল্যরা তাহাদের বাটীতে আসিয়াছে। এতাবৎকাল দ্বিধাশূন্য হইয়া তাহাদের সংসারে অমূল্যর কোন ক্লেশ বা অসুবিধা না হয় সেদিকে সে যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছিল। এক্ষণে কিন্তু তাহার নিজের আচরণ আপনার কাছেই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইল। কোন নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিকে সচরাচর যেভাবে লোকে যত্ন করিয়া থাকে, অমূল্যর প্রতি তাহার ব্যবহার ঠিক সেইরূপ হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। যেন বিদ্যুতের যত্ন একটু মাত্রা ছাড়াইয়াই চলিয়াছে, যাহা তাহার কাছে কিছু অসঙ্গত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

আশ্রয়প্রাপ্ত গৃহশিক্ষকের আপন নিয়োগকর্ত্তার বা তাহার আত্মীয়ের প্রতি যেরূপ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ভদ্রব্যবহার বা বিনয় প্রদর্শন করা উচিৎ,

অমূল্যর ব্যবহারে বিদ্যুৎ কিন্তু বহুচেষ্টাসত্ত্বেও একদিনের জন্য তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারিল না। যখনই ‘এটা করিতে হইবে’ শুনিয়াছে, আপনার শত অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া অমূল্য তৎক্ষণাৎ তাহা করিয়াছে ; বংশীর মুখে ‘দিদিমণি বলিতেছেন—এটা করা চলিবে না’ শুনিয়া অমূল্য কোনদিন সে কথার প্রতিবাদ বা অন্যথাচরণ করে নাই ; ‘এখনই অমুক জায়গায় যাওয়া চাই’ শুনিয়া অমূল্য অবিলম্বে সেইস্থানেই ছুটিয়াছে ; অথচ কোনওদিন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সে কোনও কার্য্য করে নাই। সে যে একজন শিক্ষিত যুবক, তাহার যে কোনও স্বাধীন ইচ্ছা থাকিতে পারে, এরূপ ভাব কোনওদিনই তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পায় নাই। সে যেন ইচ্ছা করিয়াই আপনার সমস্ত স্বাধীনতাটুকু নিঃশেষে বিদ্যুৎ এবং তাহার পিতার অভিরুচির মধ্যে বিলাইয়া দিয়া বসিয়া আছে।

বিদ্যুতের একটু রাগ হইল। ইহা কিরূপ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ? তিঁনি কি বলিতে পারেন না, যে বিদ্যুতের কোন্ অনুরোধ রক্ষা করিতে তাঁহার কতখানি ক্ষতি হইতেছে ? বলিলে কি সে অমূল্যবাবুকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিবে ? কেন, তাঁহারা এখানে কি পিতার নিছক্ দয়াতেই রহিয়াছেন ? কনকের ছাত্রজীবন যে অমূল্যর আপ্রাণ চেষ্টাতেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, তাহার কি কোনও মূল্যই নাই ? তাঁহার পিতামাতা যে এই বৃহৎ সংসারটী সকলপ্রকার ক্লেশস্বীকার করিয়াও মাথায় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার ঋণ কি সহজে পরিশোধ করা সম্ভব ? বিদ্যুতের পিতা আশ্রয় না দিলে কি তাঁহাদের অন্য আশ্রয় মিলিত না ?

অমূল্যর এই কৃতজ্ঞতাবোধ বিদ্যুতের অন্তরে বড়ই পীড়া দিতে লাগিল।

অমূল্যর ঘরটীকে সে যে নিত্য ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া

সাজাইয়া রাখিয়া আসে, কই তাহাতেও তো তিঁনি কোনদিন 'হাঁ' ও বলেন নাই, 'না' ও বলেন নাই? এই যে সেদিন তাঁহার ঘরে সে বাছাইকরা খানকতক ছবি ঝুলাইয়া দিয়া আসিল, তাঁহার পুরাতন টেবিলটার পরিবর্ত্তে পিতাকে বলিয়া সেক্স্‌পিরিয়ান ডেস্ক্‌ বসাইয়া দিল, তাহাতেও তো তাঁহার কোনও আনন্দের আভাষও পাওয়া গেল না? এসব বিষয়ে অমূল্যবাবু যেন সম্পূর্ণ উদাসীন। সে আবার মরিতে নাকি তাঁহার কাপড়ে এবং রুমালে সারাদিন বসিয়া বসিয়া নাম লিখিতে গিয়াছিল?

বিদ্যুৎ স্থির করিল, যে শুধু ভদ্রতা রক্ষার জন্যই অমূল্য বাবু তাহার কথায় কোন প্রতিবাদ করেন না, নতুবা তাহার সস্নেহ তত্ত্বাবধান করাটাকে তিঁনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্যই করিয়া থাকেন। বিদ্যুৎ নামে যে একটী প্রাণী তাঁহার হিতাকাঙ্খিনী হইয়া সর্ব্বদা ঘুরিয়া মরিতেছে, ইহা তিঁনি আদৌ গ্রাহ্য করেন না। উত্তম! এখন হইতে সে যথেষ্ট সংযত হইয়াই চলিবে; এবং বিদ্যুতেরও ঔদাসীন্য তাঁহাকে কিছুমাত্রও আঘাত করে কিনা, ইহাও সে দেখিতে ছাড়িবে না!

অমূল্য দেখিল, ইদানিং তাহার বৈকালিক জলখাবার কোনওদিন আসে, কোনও দিন বা আসে না। কলেজে যাইবার সময় দেখে, পড়িয়া উঠিয়া যাইবার সময় পুস্তকগুলি সে যেভাবে ছড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিল, সেগুলি সেইভাবেই পড়িয়া আছে। সে খানকতক আবশ্যকমত তুলিয়া লইয়া যায়, কোনওদিন বা তাড়াতাড়ি শুধু খাতাখানাই লইয়া গিয়া লেক্‌চার নোট্‌ টুকিয়া লইয়া আসে। রাত্রি জাগরণ করিয়া পড়িলে আজকাল কেহ তাহার দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়া যায় না। আজকাল বাহির হইবার সময় কোনওদিন তাহার স্নান হয়, কোনওদিন সময় হয় না, বা সে ভুলিয়া যায়।

ইন্দু চলিয়া যাওয়ার পর হইতে কিছুদিন হইল, অমূল্যর মন ততটা ভাল নাই। মধ্যে মধ্যে ইন্দুর সেই বিষাদভরা মুখখানি মনে পড়িয়া গিয়া সে বড় ব্যথা বোধ করে। ইহার মধ্যে সে অতখানি লক্ষই করে নাই, যে বাটীর ভিতর কতখানি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যাইতেছে। এক এক দিন মনে হয় ঘরটা তাহার অতি বিশ্রী হইয়া আছে। কিন্তু সে কাহাকেও কিছু বলে না। কনককে একদিন একটা অঙ্ক বুঝাইতে গিয়া সে দেখিল পেনসিল্‌টার সীস্ নাই; সে ছুরি খুঁজিল; পাইল না।

টেবিলের উপর দোয়াতদানের কাছে চিরদিনই ছুরি থাকিত। নাই দেখিয়া কনক বলিল—কোথায় গেল, মাষ্টার ম'শায়?

অমূল্য বলিল—তাইত! কখনও ত হারায় নি!

অন্নপূর্ণা একদিন অমূল্যকে ডাকিয়া বলিলেন—অমূল্য, জলখাবার খেয়েছিস্?

অমূল্যর স্মরণ হইল, জলখাবার পায় নাই। বিদ্যুৎ নিকটে বসিয়া পান সাজিতেছিল। উত্তর শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইল।

অমূল্য বিদ্যুৎকে দেখিয়া ভাবিল, তাহার হাতেই তো জলযোগের ব্যবস্থা ছিল; পাছে বিদ্যুৎ অপ্রস্তুত হইয়া পড়ে সেইজন্য সে উত্তর করিল—খেয়েছি মা।

তাহাকে বাঁচাইবার জন্য অমূল্যর এই যে চেষ্টা, ইহাতে বিদ্যুৎকে আঘাতটা বেশী করিয়াই লাগিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—আজকাল অত রাত জেগে পড়িস্, একটা শক্ত ব্যারামে পড়্‌বি যে বাবা?

বিদ্যুৎ সকলের অলক্ষ্যে দেখিয়া লইল—সত্যইতো! এতদিন নজর করে নাই? তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, চক্ষের নীম্নাংশে কালি

পড়িয়াছে যে? মনে হইল, এ তাহারই দোষ। সে যদি একটু মনোযোগ করিত তাহা হইলে তো এরূপ হইত না?

বিদ্যুতের হৃদয়ের মধ্য হইতে একটা 'আহা' উঠিয়া তাহার মনে আত্মগ্লানির সৃষ্টি করিল। কোথা হইতে একটা এতটুকু মেয়ে, ইন্দু আসিয়া যেন তাহার মাথাটা খারাপ করিয়া দিয়া গিয়াছে! সে আপনার বুদ্ধিকে ধিক্কার দিল।

অমূল্য বলিল—কি করি মা, এম এ পরীক্ষার আর তো বেশী সময় নেই?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—কেন রে? দু'দুটো আইন পরীক্ষা তো রাত্ না জেগেই দিয়েছিলি? না বাবা, অমন করিস্‌নি। যা, সন্ধ্যে হয়ে এল কনককে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অমূল্য চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখ ত মা বিদ্যুৎ? এমন কর্‌লে কি চলে? অমূল্যর নিজের দিকে যদি এতটুকু হুঁশ্ থাকে।

বিদ্যুৎ নিরুত্তর হইয়া রহিল। বলিবেই বা কি?

পরদিন দুপুরে অমূল্যর ঘরখানিতে গিয়া সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। মাগো! এ হইয়াছে কি? টেবিল, আলমারী হইতে এক একখানি করিয়া প্রায় সমস্ত পুস্তকগুলিই অমূল্যর শয্যার চতুর্দ্দিকে জমা হইয়া উঠিয়াছে; পুস্তকগুলি বা কাগজপত্র সরাইয়া, বংশী বিছানার চাদরখানি বহুদিন যাবৎ সাহস করিয়া বদলাইয়া দিতে পারে নাই; যদি কোনও আবশ্যকীয় লিখিতাংশ হারাইয়া যায়? আল্‌না হইতে কাপড়গুলা গিয়া চেয়ারে উঠিয়াছে, জামাগুলা টেবিলের উপর আশ্রয় লইয়াছে; দেখিয়া সে হাসিবে, কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না। এমন করিয়া কি মানুষ থাকিতে পারে?

একে একে সকল বস্তুগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। কলেজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া অমূল্য সবিস্ময়ে দেখিল, বিদ্যুৎ টেবিলটী সাজাইতেছে। অমূল্য বলিয়া ফেলিল—আপনি!

ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া বিদ্যুৎ উঠিয়া পড়িল। অমূল্য তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইতেছিল; বিদ্যুৎ সঙ্কুচিতা হইয়া বলিল—আমি চলে যাচ্ছি।

অমূল্য বলিল—না, না, আমিই না হয় ততক্ষণ বাইরে একটু অপেক্ষা করছি। কিন্তু আপনার এসব কি হচ্ছে বলুন্ তো?

বিদ্যুৎ কোন উত্তর না দিয়া আপনমনে প্যাডেতে ব্লটিং আঁটিতে লাগিল।

অমূল্য বলিল—আমার মত হতচ্ছাড়ার জন্যে আপনি কেন এত কষ্ট করতে গেলেন?

বিদ্যুৎ দোয়াতদান পরিষ্কার করিতে লাগিল; কিছু বলিল না। অমূল্য কলেজের পুস্তকগুলি টেবিলে রাখিয়া বলিল—যদি কোনরকমে এ সব খবর ভগবানের কাণে গিয়ে পৌঁছায়, তাহ'লে আপনার নাকালের একশেষ হবে কিন্তু?

বিদ্যুতের ওষ্ঠে হাস্যের রেখা পড়িল; সে বলিল—আমার না আপনার?

অমূল্য বলিল—তাঁর সঙ্গে আমার সদ্ভাব তেমন নেই বলেই 'আপনার' বল্‌ছিলুম। তা না হয় আমারই হ'ল। তাতে আপনার দুঃখ কেন?

—কারও কষ্ট দেখ্‌লেই লোকের দুঃখ হয়।

—সকল লোকেরই কি হয়?

—সকলে কি সমান?

—এত বড় বড় চোখ্ দুটো দিয়ে আপনাকে যখন দেখ্‌ছি, তখন পরাজয় স্বীকার কর্‌তেই হ'ল।

বিদ্যুতের গণ্ডস্থল আরক্ত হইয়া উঠিল; সে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

অমূল্য অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—কিছু মনে করবেন্ না। আমারই আগে যাওয়া উচিৎ ছিল—

বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

বিদ্যুৎ ভিতরে গিয়া বংশীকে বলিল—মাষ্টার মশাইকে জলখাবার দিলিনে?

বংশী বলিল—আপনি তো বলেন্ নি?

—আমি যদি না বলি তো কি, একটা লোক উপোষ করে থাক্‌বে নাকি?

বংশী দিদিমণির ভাবগতিক না বুঝিয়া চুপ্ করিয়া রহিল। সে তো কোনদিন আপনা হইতে মাষ্টারকে খাবার দেয় নাই? তবে এই তিরস্কারের অর্থ কি? ভাবিল, বড়লোকদের কথা বোঝা শক্ত!

বিদ্যুৎ ডাকিল—আয়, দিইগে।

বংশী বিনাবাক্যব্যয়ে তাহার অনুসরণ করিল।

২৩

তারিণীর কনিষ্ঠপুত্র ভোলানাথ যখন গ্রামের প্রতিবেশিনীদিগের স্নান করিবার ঘাটের নিকটতম স্থানটীকেই মৎস্য ধরিবার সর্ব্বোত্তম স্থল বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল এবং ছিপের ফৎনার পরিবর্ত্তে স্নানার্থীনীদিগের উপর দৃষ্টি রাখাই অধিক আবশ্যক বোধ করিল, তখন সে যে সাবালক হইয়াছে ইহাতে আর কাহারও সংশয় রহিল না। চন্দর, নিতাই, মণ্ডল প্রভৃতি পাত্রীর সন্ধানে ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন; এবং 'লুচি পাকিতেছে' এই সংবাদটী গ্রামময় রাষ্ট্র করিয়া দিলেন। যে দেশে নারী, মুখে না হউক, কার্য্যেও, এখনও পুরুষের পণ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আছে সে দেশে কন্যার অভাব হইল না; পাত্রী আসিতে লাগিল অনেক; কিন্তু তারিণীর তেমন পসন্দ হয় না। চন্দর বলেন—ডানাকাটা চাও নাকি হে?

তারিণী বলেন—বুঝ্‌ছ না চন্দর। এই আমার শেষ কায। ঘটাও

করতে হবে যেমন, আবার মেয়েও দেখ্‌তে হবে তেমন, যা'তে লোকে যেন বলে, হ্যাঁ, চাটুজ্যে ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে তুল্‌ল বটে!

চন্দর বলিলেন—তবেই ভোলানাথের বিয়ে দিয়েছ।

তারিণী বলিলেন—কেন?

একটিপ্‌ নস্য লইয়া নিতাই বলিলেন—বল্‌লে তো ভাল তারিণী; কিন্তু এই হাবাতে গাঁয়ে এমনটী তুমি পাবে কোথায়?

কথাটা হইতেছে এই, যে তারিণী মেয়ে দেখিলেন অনেক, কিন্তু শঙ্করের মেয়ের মত সুশ্রী একটীও চোখে পড়ে না; পাল্‌টী ঘরও বটে। কিন্তু সে দিকে অন্তরায়ও তো কম নয়? সমাজচ্যুত করা পর্য্যন্ত এই কয়েক বৎসর যাবৎ তাহাদের সহিত মেলামেশা একরূপ নাই বলিলেই চলে। তাঁহারই চক্রান্তে হারাণ দেশত্যাগী হওয়ায়, শঙ্কর তো কিছুদিন মার্‌মুখী হইয়া উঠিয়াছিল! এখন তাহার ততখানি রোখ্‌ না থাকিলেও, তাঁহাদের উপর বিদ্বেষ যে নাই একথা জোর করিয়া বলা যায় না। তবে তাহারও তো কন্যাদায়? এই যা' ভরসা। অমন মেয়ে কি সহজে হাতছাড়া করা সম্ভব?

তারিণী সঙ্কল্পচ্যুত হইবার পাত্র নহেন। বলিলেন—পাবো না কিহে? এইতো পাশেই রয়েছে। চোখ্‌ মেলে তো দেখ্‌বে না নিতাই? শুধু ঘুরেই মর্‌ছো!

সকলেই সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখের প্রতি প্রশ্নসূচক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; পাশেই রয়েছে? তারিণী বলে কি? কে সে?

সহাস্যে তারিণী বলিলেন—সদ্ভাবটা তেমন নেই, এই যা। কেমন নয় চন্দর? বলে, একঘরে করেছি। আরে একঘরে কি আর এম্‌নিই করেছি? মেলামেশা করিস্‌ বলেই তো? এখন হারাণটাই যখন চলে গেল, তোরা আর একঘরে কিসের? না হয়, দু'টাকা

খরচ করে একটা পেরাচিত্তির করে ফেল্লি রে বাপু? এমন আর কি?

মণ্ডল বলিলেন—কে? শঙ্করের কথা বল্‌ছ?

তারিণী বলিলেন—হ্যাঁ হে হ্যাঁ। কেন, মেয়েটা কি মন্দ?

তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন, যে ইন্দু সুন্দরী বটে; এবং তারিণীর যে নজর বলিয়া একটা বস্তু আছে তাহাতেও সন্দেহ নাই।

চন্দর আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন—ধরেছ তো ঠিক্ তারিণী! এ হ'লে তো ভালই হয়! গাঁয়ের ভেতর। আপ্‌না আপ্‌নি। কিন্তু—!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তারিণী বলিলেন—আবার কিন্তু কি চন্দর?

জুতসই একটিপ নস্য নাসিকার মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া নিতাই বলিলেন—নাঃ। এতে আর কিন্তু কি?

চন্দর নূতন সাজিয়া আনা কলিকাটীতে ফুঁ দিতে দিতে বলিলেন—বল্‌লে তো নিতাই? শঙ্করটা যে রোকালোক, তা'র কাছে এগোয় কে?

চক্ষুবিস্ফারিত করিয়া যেন মানসচক্ষে শঙ্করের সেই বিরাট্‌বপু সন্দর্শন করিতে করিতে নিতাই বলিলেন—তা ঠিক্। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও বলে, অমন লোকের নিকটে গেলে প্রাণহানির সম্ভাবনা।

মণ্ডল বলিলেন—রেখে দাও তোমার প্রাণহানির সম্ভাবনা। বলি, তা'রও তো দায়? তারিণীর ঘরে মেয়ে দেওয়া তো ভাগ্যের কথা বল্‌তে হবে।

চন্দর বলিলেন—তবে না হয়, কপাল ঠুকে যাব একবার? কি বল?

তারিণী বলিলেন—ক্ষতি কি? না হয়, দেনাপাওনার কথাটা একটু বুঝে সুঝে দেখ্‌ব'খন?

নিতাই বলিলেন—হুঁঃ, আমিও তো তাই বলি? গিলে তো আর খাবে না?

শঙ্করের নিকট প্রস্তাবটী উত্থাপন করিয়া দেখাই সাব্যস্ত হইল। প্রলোভনও তো কম নয়? জাতে তোলা হইবে, তারিণীর ন্যায় বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি বৈবাহিক হইবে, দেনাপাওনার গোল হইবে না! মণ্ডল, নিতাই, চন্দর প্রভৃতি গাত্রোত্থান করিলেন। শুভকার্য্যে বিলম্ব করিতে নাই। আজই শঙ্করের নিকট কথাটা তুলিতে হইবে।

জগতে এমন একশ্রেণীর জীবও আছে, যাহারা অবিচলিতচিত্তে একজনকে পদতলে দলিত করিতে পারে এবং পরক্ষণেই আবার তাহার দ্বারাই নিজের কোন সুবিধা হইবে বুঝিতে পারিলে,উৎপীড়িত ব্যক্তিটীকে এমন আগ্রহের সহিত সেবা, যত্ন, খাতির প্রভৃতি করিতে থাকে যে সে ব্যক্তি পূর্ব্বমুহূর্ত্তের কথা আর স্মরণ করিবারও অবসর পায় না। শত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুধু চক্ষুলজ্জার জন্যই, কত মুহূর্ত্তের তুচ্ছ মনোমালিন্য আমরণের বিচ্ছেদের কারণ হইয়া গিয়াছে। অথচ, সেই মনুষ্যসুলভ লজ্জাকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত একই ব্যক্তি অন্য কাহাকেও উৎপীড়নের অব্যবহিত পরেই, কেমন করিয়া পুনরায় তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে পারে বা তাহার দ্বারস্থ হইতে পারে, ইহা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। যাহা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর তাহা অসম্ভব নহে; এবং সম্ভব বলিয়াই অভিধানে 'অসাধারণ' শব্দটীও স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে।

এই অসাধারণত্ব দাবী করিতে পারেন, তারিণী এবং তাঁহার নিত্যপার্শ্বচরগণ। অতএব, অবলীলাক্রমে তাহারা শঙ্করের নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

শুনিয়া কিন্তু শঙ্কর দপ্ করিয়া খড়ের আগুণের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। স্পর্দ্ধা তো কম নয়? সেই মনুষ্য-চর্ম্মাবৃত নরপশুটার মূর্খ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের সহিত ইন্দুর বিবাহ? ইহারা মনে করিয়াছে কি?

কে সমাজে উঠিতে চায়? যে জাতির মধ্যে তারিণীর মত লোক আছে, যে সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা তারিণী, তিনি যে এতদিন সেই সমাজের একজন ছিলেন, একথা চিন্তা করিতেও আজ ঘৃণায় তাহার সর্ব্বশরীর সঙ্কুচিত হইয়া উঠে।

শঙ্কর ঝাঁঝাঁইয়া উঠিলেন—খবর্দার্ বল্‌ছি চন্দর! বাড়ীতে ঢুকে যদি ফের অপমান কর্‌তে এস, তোমাদের মাথা আস্ত থাক্‌বে না!

সদর দরজাটা উন্মুক্ত আছে কি না দেখিয়া লইয়া, চন্দর ভয়ে ভয়ে বলিলেন—রাগ কর, না হয়, চলে যাচ্ছি। কিন্তু ইন্দুরও তো বিয়ের বয়েস হয়েছে?

—হয়ে থাকে হয়েছে। সে আমি বুঝ্‌ব। একটা নিরীহ লোক্‌কে ভিটেছাড়া করে, এক সতীসাধ্বীর নামে কলঙ্ক রটিয়েও আশা মেটেনি? আবার এসেছ আমার মেয়ের সর্ব্বনাশ কর্‌তে? এখনও ভাল চাও তো যাও বল্‌ছি!

শেষের কথা কয়টা কানে না তুলিয়াই মণ্ডল বলিলেন—এখন রাগের মাথায় মেয়েটার ভবিষ্যৎ বুঝ্‌তে পার্‌ছ না শঙ্কর; মিছামিছি আমাদের গাল' দিচ্ছ। একটু মাথা ঠাণ্ডা করে, বুঝে দেখ, আমরা তোমার ভালর জন্যই এসেছি।

শঙ্করের স্বর উচ্চে উঠিল—বটে! তোমরা এসেছ, আমার ভালর জন্যে? ওরে আমার হিতাকাঙ্খীর দল!

পরে আপনার ওষ্ঠ আপনি দংশন করিয়া বলিলেন—এখন শুন্‌তে চাই, তোমরা এই মুহূর্ত্তে আমার বাড়ী ছেড়ে যাবে কি না—?

বলিয়া শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার ভাবগতিক সুবিধার নয় দেখিয়া চন্দর, নিতাই, মণ্ডল প্রভৃতি 'এই যাচ্চি, এই যাচ্চি' বলিয়া উঠি কি পড়ি করিতে করিতে বাটীর দরজা পার হইয়া গেলেন।

ইন্দুর জননী ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—কাযটা কি ঠিক্ হল ?

রোষকষায়িতলোচনে শঙ্কর তাহার প্রতি চাহিয়া বলিলেন—তবে কি কর্‌তে বল শুনি ?

—এক গাঁয়ে বাস করে, ওদের অমন করে অপমান করা ?

ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে শঙ্কর বলিলেন—একঘরে হওয়া পর্য্যন্ত এতদিন কোন্ ভিন্‌গাঁয়ে গিয়ে বাস কর্‌ছি, ইন্দুর মা ?

তাহার রাগ দেখিয়া ইন্দুর জননী আর কিছু বলা সঙ্গত মনে করিলেন না ; অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

এদিকে মুক্তকচ্ছ সাম্‌লাইতে সাম্‌লাইতে চন্দর, নিতাই ও মণ্ডল তারিণীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া তারিণী উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—কিহে ? ব্যাপার কি ?

চন্দর উপবেশন করিয়া বলিলেন—আর ব্যাপার ! তামাক্ বল। তামাক্ বল।

—বল্‌ছি, তবু কি হ'ল শুনি ?

মণ্ডল বলিলেন—শুন্‌বে আর কি তারিণী ! অপমান যা হ'বার তা'তো হ'ল ; শেষে প্রাণটা নিয়ে পালানই দায় আর কি ?

নিতাই নস্যের শামুকটী খুলিতে খুলিতে বলিলেন—তখনই বলেছিলাম। শাস্তর কি আর মিথ্যে হয় ?

তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—সত্যি বল্‌ছ ?

চন্দর বলিলেন —এই নাও। মিথ্যে বল্‌ব কিহে ?

ক্রোধে, অপমানে, দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিতে করিতে তারিণী বলিলেন—আচ্ছা !

২৪

বাহিরের বৈঠকখানায় বসিয়া হারাণ হিসাবপত্র দেখিতেছিলেন। সম্মুখে নরেন্দ্র বাবু ক্রোড়ের উপর একটা তাকিয়া রাখিয়া ধূমপান করিতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে হারাণকে আবশ্যকমত সাহায্য করিতেছিলেন। পিয়ন আসিয়া কতকগুলি চিঠিপত্র দিয়া গেল। হারাণ সেগুলির শিরোনামা দেখিয়া কয়েকখানি নরেন্দ্র বাবুকে দিলেন, কয়েকখানি হিসাবের খাতার উপর রাখিলেন এবং অবশিষ্ট একখানি নিজে লইলেন।

নরেন্দ্র বাবু বলিলেন—ওখানা কোথেকে এল হে ভায়া? তোমার শাশুড়ীর নয়তো?

হারাণ তৎক্ষণাৎ পত্রখানি নরেন্দ্র বাবুর হস্তে দিয়া বলিলেন—দেখুন্ না?

—তোমার নামের চিঠি আমি কেন পড়্‌ব হে?

—আপনার কাছে গোপন কর্‌বার তো আমার কিছুই নেই ?

প্রীত হইয়া নরেন্দ্র বাবু বলিলেন—তবে পড়ে ফেল। তারপর তোমার মুখ থেকেই শোনা যাবে।

হারাণ সেখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। কপোলে চিন্তার রেখা দৃষ্ট হইল। শাশ্ব্যর পত্রই বটে। দীর্ঘ পত্র।

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর করিয়া শঙ্কর আনুপূর্ব্বিক সমস্তই লিখিয়াছে। ভোলানাথের সহিত ইন্দুর বিবাহের জন্য চন্দর, নিতাই প্রমুখাৎ তারিণীর প্রস্তাব উত্থাপন হইতে, তাহাদের প্রতি শঙ্করের নিজের ব্যবহার পর্য্যন্ত তিনি কিছুই গোপন করেন নাই। অবশেষে লিখিয়াছেন—দাদা, তাহাদের প্রতি আমার এই রূঢ় ব্যবহারে হয়ত আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন। শত দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও আপনি কাহাকেও দুইটা উচ্চ জবাব দিতে জানেন না। কেহ আপনার নিকট অপরাধ করিবার পূর্ব্বেই আপনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া বসিয়া থাকেন। আজীবন এত উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছেন কিন্তু একদিনের জন্যও সহোদরের উপর আপনাকে ক্রোধ করিতে দেখি নাই। কিন্তু আমাদের রক্তমাংসের শরীর। অন্যায় যখন সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, রাগ তখন আমরা আর সম্বরণ করিতে পারি না ; চন্দর যখন আমাকে প্রলোভন দেখাইতেছিল, তখন আমার বেশী করিয়া মনে পড়িতেছিল সেই দিনকার ঘটনা ; যেদিন অন্নুদি'কে লইয়া আপনি একবস্ত্রে আজন্মের ভিঠাত্যাগ করিয়া পথের কাঙ্গালের মত বাহির হইয়া গিয়াছিলেন ; আর দূর হইতে উহারাই ঠাট্টা ও বিদ্রূপ দ্বারা আপনাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেদিন যে আরও কিছু করিয়া বসি নাই, সে শুধু আপনার আশীর্ব্বাদ। ইন্দুর মা তো সেই হইতে অত্যন্ত ভীতা

হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রতিমুহূর্ত্তে আপনার সহোদরের তরফ্ হইতে একটা ভয়ানক কিছু আশা করিতেছে। সারাগ্রামখানির মধ্যে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই যে আমাদের হইয়া দুইটা কথা বলিবে। দাদা, আমি নিজের জন্য আদৌ ভীত নই; ইন্দুর মার জন্যও ততটা নয়, যতটা ইন্দুর জন্য। পূর্ব্বে ইন্দুর জন্য ভাবিতাম না; কিন্তু এখন সে বিবাহযোগ্যা হইয়াই আমাকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। দিবারাত্রি ইন্দুর মা'র নিকট হইতে আশঙ্কার কথা শুনিয়া শুনিয়া মধ্যে মধ্যে মনে হয়, সত্যই যদি আজ আমার একটা কিছু হয়, তাহাহইলে ইন্দুর কি হইবে? মনে করি, ভয় কি? আমার দাদা আছেন। তিনি কি আর ইন্দুকে ফেলিতে পারিবেন? আমি জানি ইন্দু আপনারই। সেও তো বাল্যাবধি আমাদিগের অপেক্ষা আপনাকে ও অনুদিদিকে বেশী আপনার বলিয়াই জানে। দাদা, ইদানিং আমার মন কেন জানিনা, একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাই শত যুক্তি থাকা সত্ত্বেও মনে হয়, যদি দাদার মুখ থেকে একবার অভয়বানী শুনিতে পাই, তাহাহইলে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি। আপনি যে আমার ভরসা দাদা, একথা আমি শতচেষ্টাতেও মুহূর্ত্তের জন্য অবিশ্বাস করিতে পারি না।

এইরূপে অমূল্যর হাতে ইন্দুকে তুলিয়া দিবার বাসনা যে ইন্দুর জন্মাবধিই তিনি পোষণ করিয়া আসিতেছেন, ইহা শঙ্কর বিস্তারিতভাবেই লিখিয়াছেন। তাহার জমিজমা যাহা কিছু আছে, বেশী না হইলেও, তাহা যে অমূল্যর নামেই তিনি শীঘ্র রেজেষ্ট্রী করিবার মনস্থ করিয়াছেন, ইহাও তিনি লিখিয়াছেন। শেষের ছত্রে শঙ্কর, ইন্দুর ভালমন্দ সমস্তই ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া হারাণের উপরই ন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন।

পাঠান্তে হারাণ পত্রখানি নরেন্দ্র বাবুর হস্তে দিয়া বলিলেন—আপনিই পড়ুন্।

—কেন হে? মোদ্দা কথাটাই বলে ফেল না?

—চিঠিখানা পড়ে মনটা বড় বিকল হয়ে পড়্ল। আপনিই পড়ে দেখুন্।

অগত্যা নরেন্দ্র বাবু পত্রখানি লইলেন; বহুক্ষণ ধরিয়া নিবিষ্টমনে তাহা পাঠ করিলেন। পরে পত্রখানি হারাণকে প্রত্যর্পণ করিয়া, কিছুক্ষণ যাবৎ গড়গড়ার নল হইতে ঘন ঘন ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। উভয়েই চিন্তানিমগ্ন হইলেন।

কিছুদিন হইতে নরেন্দ্র বাবু অমূল্যকে জামাতাপদে বরণ করিবার আশা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। অমূল্য সর্ব্বাংশে বিদ্যুতের ন্যায় বিদুষী কন্যার উপযুক্ত পাত্র। তাহার হস্তে বিদ্যুৎকে তুলিয়া দিতে পারিলে, বিদ্যুৎ যে সত্যই সুখী হইবে ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য অন্নপূর্ণা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া হারাণ যখনই তাঁহাকে বিদ্যুতের বিবাহের জন্য সজাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই তিঁনি ব্যস্ততার যে কোনও কারণ নাই, ইহাই বুঝাইয়া হারাণকে নিরস্ত করিয়াছেন; এবং কন্যার বয়ঃক্রম ক্রমশঃই যে বৃদ্ধি পাইতেছে সেজন্য চিন্তিত না হইয়া বরং মনে মনে হাস্যই করিয়া আসিয়াছেন। শুধু অমূল্যর এম এ পরীক্ষাটা শেষ হইবার অপেক্ষায় তিঁনি ছিলেনমাত্র। আজ কিন্তু কোথাকার জল কোথায় গিয়া মরে দেখিয়া তিঁনি বিস্মিত হইলেন। কোথায় এক সুদূর গ্রামে বসিয়া তারিণী কল টিপিতেছে এবং তাহারই অদৃশ্য প্রভাব অনুভব করিতে হইতেছে কলিকাতায় বসিয়া নরেন্দ্রবাবুকে?

হারাণ বলিলেন—এখন আমায় কি কর্‌তে বলেন?

হাতের নল্‌টা সজোরে মেঝেয় নিক্ষেপ করিয়া নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—বল্‌ব আবার কি হে? পাঁজী দেখ্‌তে লিখে দাও।

হারাণ তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

—হাঁ করে রইলে যে হে ভায়া? এ আর বুঝ্‌লে না? অমূল্যর এম, এ পরীক্ষার পরই যেদিনটা ভাল পাওয়া যাবে সেইদিনই শুভকার্য্য করে ফেলা চাই। এই কথাটা গুছিয়ে শঙ্করকে লিখে দাও। ব্যস্‌। এর আর ভাবনার কি আছে?

বলিয়া হাস্য করিতে করিতে তিঁনি বলিলেন—আর দেখ ভায়া, বৌমার বড় কড়া তাগাদা শুন্‌তে পাই। ঐ সঙ্গে বিদ্যুতেরও একটা চেষ্টা দেখ। বুঝ্‌লে না? হুঁঃ। বুঝ্‌বে যদি তো এত দুঃখ পাবে কেন? না হয়, আমিই গা' করিনি। এতদিন একটা না একটা পাত্র যোগাড় করে তো রাখ্‌তে হয়? যাক্‌। আর বিলম্ব নয়। ঐ একসঙ্গেই ইন্দুর আর বিদ্যুতের, বুঝ্‌লে না—?

হারাণ বলিলেন—তাহ'লে তাই লিখে দি, আপনি যখন বল্‌ছেন।

নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—আল্‌বৎ। বল্‌বই তো? দাও, লিখে দাও।

২৫

বহুদিন হইতে যে সুদের কারবারটী চলিতেছিল, ইদানিং তাহার উপর তারিণীর কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে দেখা গেল; বিশেষ করিয়া মুসলমানপাড়ার উপরই তাঁহার ঝোঁকটা যেন কিছু বেশী। তাঁহার বাড়িতে গফুর, রম্‌জান্, কুদ্রুৎ, কাদের, জয়নল্, গোলাম, হুসেন প্রভৃতির যাতায়াত পড়িয়া গেল। কেহ তারিণীর পায়ে জড়াইয়া ধরিল, কেহ তাঁহার দ্বারে কাঁদিয়া ধর্ণা দিল, কেহ রোগশীর্ণ শিশুপুত্রের হস্ত ধরিয়া তারিণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—মকুব্ প্রার্থনা করিতে।

তারিণী সুদের কারবারে দুইপয়সা করিয়াছেন। এটুকু তিনি বিলক্ষণই জানিতেন যে ব্যবসায়ে নামিতে হইলে দয়াধর্ম্ম দূরে পরিহার করিতে হয়। খাতকের হাজা, মরা, সুখা দেখিতে গেলে চলে না। অতএব, বকেয়া সুদের দাবীতে কাহারও ভিটামাটী ক্রোক্ হইয়া গেল,

কাহারও স্ত্রীপুত্র পথে দাঁড়াইল, কাহারও সম্বৎসরের খোরাক তারিণীর গোলায় গিয়া উঠিল। মুসলমানপাড়ায় অনেকেরই বাটীতে হাহাকার পড়িয়া গেল।

সেদিন আহারাদির সময় অতিক্রম করিয়া দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইতে চলিল, তথাপি তারিণীর বৈঠকখানার দ্বার হইতে গুণ্ডাসর্দ্দার আলি মিঞা আর উঠিতে চায় না। উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর অজন্মা হওয়ায় তাহাকেও তারিণীর কবলে পড়িতে হইয়াছে।

চন্দর বলেন—কিরে আলি? বাড়ী যাবিনে?

জোড়হস্তে আলি বলে—হুজুর মা বাপ্।

চন্দর বলিলেন—আরে গেল যা! 'হুজুর মা বাপ্', 'হুজুর মা বাপ্' বল্‌লে কি আর পেট ভরবে?

তারিণী বলিলেন—বলত চন্দর? এরা মনে করে কি? একি আর একআধ টাকার ব্যাপার, যে ছাড়ো বল্‌লেই ছাড়া যায়?

আলি কাতরকণ্ঠে বলিল—হুজুরের যদি মর্জ্জি হয়, তা'হলে মারতেও পারেন, রাখ্‌তেও পারেন। কিন্তু এ সালের চাষের হদিস্‌টা তো জনাবের ইয়াদ্ আছে?

তারিণী ধম্‌কাইয়া উঠিলেন—চাষ-চাষ-চাষ। সবার মুখেই ওই এক কথা, চাষের হদিস্‌টা জনাবের কি ইয়াদ থাক্‌বে শুনি? মুঠো মুঠো টাকা যখন কর্জ্জ করে নিয়ে যাস্, তখন কি চাষ দেখে তবে শোধ দিবি বলেছিলি?

আলি বলিল—আল্লার কিরে করে বল্‌ছি হুজুর! বেগর্ মেহেরবাণী আমি বাল্‌বাচ্চা নিয়ে জানে মারা যাবো।

'যাস্ যাবি। তা'তে আমার কি?' বলিয়া তারিণী খাতাপত্তর গুটাইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আলি মিঞা কাঁদিয়া ফেলিল।

সে বলিল—দোহাই হুজুরের ! একটা কিস্তি সবুর্ করুন। তারপর বেবাক্ চুকিয়ে দোব—

তারিণী গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—আর একদিনও সবুর্ করবো না। আজ সন্ধ্যের মধ্যেই আমার টাকা চাই।

বলিয়া আলির অলক্ষ্যে চন্দরকে একটা ইঙ্গিত করিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন।

স্কন্ধের গামছায় চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে আলি অনন্যোপায় হইয়া প্রস্থানোদ্যত হইল; তখন চন্দর তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে বলিলেন—চল্‌লি নাকি রে আলি ?

পশ্চাৎ ফিরিয়া আলি অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিল—কি কর্‌ব হুজুর ?

চিন্তানিমগ্নভাবে চন্দর বলিলেন—তাই তো ! দুঃখুও হয় ! এখনও তোর নামে সাতখানা গাঁয়ের লোক ভয়ে কাঁপে, আর আজ তোর এই অবস্থা ? টাকা এমনি জিনিষ রে আলি !

সাহস পাইয়া আলি বলিল—মেহেরবাণী করে আমার হয়ে যদি ওঁনাকে একটু বলেন্ তো উপায় হয়।

পূর্ব্বস্বরেই চন্দর বলিলেন—উপায় যে একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু তুই কি পার্‌বি ?

আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের আশায় আলি তৎক্ষণাৎ বলিয়া বসিল—যা হুকুম কর্‌বেন্ হুজুর, তাতেই রাজী। আমারে বাঁচান্।

চন্দর বলিলেন—রাজী কিরে ? কি কাজ তাই শুন্‌লিনি ?

আলি বলিল—ও আর শুন্‌তে চাইনি হুজুর। ফরমাস্ করুন্, এখুনি তামিল করি।

—সেকি হয় ? ভাল করে ভেবে ছাখ্।

—ভাব্‌তি চাইনি হুজুর, আমারে বাঁচান্।

—আচ্ছা। বাঁচাবো। ঠিক্ পারবি তো ?

—আল্‌বৎ পার্‌বো হুজুর।

—কিন্তু কেউ না জান্তে পারে!

—খোদার কসম্ খাচ্ছি, জনাব।

—তবে শোন্—

বলিয়া চন্দর নিভৃতে আলিকে উপায় নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে আলিগুণ্ডার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল—এ আর পারবো না হুজুর? ওই পাজী বাম্‌নাটার ওপর আমার অনেক দিনের রোখ্। গরুটারে মেরেছিলুম্ বলে আমারে মার্‌তে আসে?

ঈষৎ হাস্য করিয়া চন্দর বলিলেন—তাইতো তোকেই বল্‌ছিরে!

আলি বলিল—আর বল্‌বেন কি হুজুর? আপনাদের সাহস পেলে আজই কাজ ফৌৎ করে দি।

—পার্লে তো ভালই?

—এই আপনারে জবান্ দিচ্ছি, আজই দোস্তিদের নিয়ে রেতের বেলায় কাজ ফতে কর্‌ব, তবে ছাড়্‌ব। হুজুরেরা শুধু দূর থেকে দেখ্‌বেন, যেন থানার দারোগার কাছে কেউ না বিল্‌কুল্ সোভে করে দেয়—

—সে আর বল্‌তে আলি? যা, তা'হলে এই কথাই রইল।

লম্বা সেলাম করিয়া আলি মিঞা প্রস্থান করিলে তারিণী হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলেন।

চন্দর বলিলেন—তারিফ কর্‌তে হয় তোমার বুদ্ধির, তারিণী।

—কেমন? যা বলেছিলুম হোল ত?

চন্দর বলিলেন—হবে না? একি যে সে চাল চেলেছ? এই মড়িপোড়া গাঁয়ে না জন্মালে রাজসিংহাসনে বস্‌তে হে। হ্যাঁ, বুদ্ধি বটে যাহোক্! আমি ভাব্‌ছিলুম, এই ব্যাটা বুঝি বেঁকে বসে।

তারিণী হাসিতে হাসিতে আর একটী কলিকা তুলিয়া লইলেন।

২৬

সেইদিনই গভীর রাত্রে, অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকারে ভূতের গল্প শুনিতে শুনিতে জননীর অঞ্চলতলে লুক্কায়িত ভীত শিশুর ন্যায়, দিগ্‌গজপুর গ্রামখানি যখন ধরণীর বক্ষটাকে নির্ব্বাক্ আবেগে আঁকড়িয়া ধরিয়া দৃশ্যমান্ জগৎ হইতে আপনার অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিতে প্রয়াসী, তখন হঠাৎ শঙ্কর মুখুর্জ্জ্যের বাটী হইতে এক আকুলকণ্ঠে চীৎকার উঠিল—মাগো!

'কি হোল গো' বলিয়া নিদ্রিতা ইন্দুর জননী ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিতেই, সম্মুখে গোটাকতক অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল; কর্ণে আসিল ইন্দুর হৃদয়বিদারক গোঙ্‌ানি ও লোকজনের ধুপ্‌ধাপ্ আওয়াজ।

ইন্দু আরও কয়েকবার 'ওমা—ওমা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল; তাহারপর তাহার আর কোনও কথা শোনা গেল না।

ইন্দুর জননী প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ওগো, কি হোল গো!

'কে রে' বলিয়া শঙ্কর শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। অবিলম্বেই দুইজন ব্যক্তি শঙ্করের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তস্কর বা দস্যু অনুমানে শঙ্কর একজনকে দুইহাতে জাপ্‌টাইয়া ধরিলেন এবং ইন্দুর জননীর উদ্দেশ্যে বলিলেন—শীগ্‌গীর হ্যারিকেন্‌টা জ্বালতো।

চতুর্দ্দিক অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। কোনও জিনিষই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না; অথচ আততায়ীগণের এই অতর্কিত আক্রমণ!

আলো! একটু আলো! আক্রমনকারীগণকে একবার দেখিতে পাইলে যে হয়! তাহারা কত জন, কে যে কোথায়, শঙ্কর যে কয়জনের সহিত সংগ্রামরত, তাহা তিনি আদৌ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ।

শঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ইন্দুর মা, একবার আলোটা ধরো। কোথায় তুমি?

স্বামীর কথায় ইন্দুর জননী শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবার প্রয়াস করিলেন; পারিলেন না; সর্ব্বাঙ্গ তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল; স্বামী যে দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু তাহার সমস্ত শক্তি যেন সহসা কে হরণ করিয়া লইয়াছে।

ওকি? ওকি?

শঙ্করের কর্ণে ইন্দুর রুদ্ধকণ্ঠের অস্পষ্ট কাতরোক্তি পৌঁছিল—বাবা!

ইন্দু? ইন্দু? কোথায় মা?

ধৃতব্যক্তিকে ত্যাগ করিয়া শঙ্কর ইন্দুর কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া ছুটিলেন। কাহারা যেন কি একটা ভারী পদার্থ বহন করিয়া

গৃহের বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর ছুটিয়া কক্ষের বাহিরে আসিলেন।

ইন্দু! ইন্দু!

ইন্দুর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। শঙ্কর পলায়মান্ ব্যক্তিগণের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে পাগলের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ইন্দু! ইন্দু!

এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে শঙ্করের মস্তকে ভীষণভাবে আঘাত করিল। সংজ্ঞাশূন্য হইয়া তিনি সদর দরজার নিকট লুটাইয়া পড়িলেন।

ইন্দুর জননী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—ওগো, আমাদের কি সর্ব্বনাশ হোল গো?

সেই মর্ম্মভেদী চীৎকারে গ্রামবাসীগণ যখন ছুটিয়া আসিল তখন তাহাদিগের আনীত আলোকে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, রক্তাক্ত কলেবরে শঙ্কর মুখুর্জ্জে সদরের সম্মুখে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন।

ধরাধরি করিয়া তাহাকে দাবার উপর তোলা হইল। প্রতিবেশিনীগণ ইন্দুর জননীর নিকট ছুটিয়া গেল। সকলে তাহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল; জিনিষপত্র কিছু লইয়া যায় নাই তো? সিন্দুকটা কোথায়? থালা বাসন ঠিক আছে তো?

ইন্দুর জননী চীৎকার করিতে লাগিলেন—ওগো, আমার ইন্দু কই? ওগো, তোমাদের পায়ে ধর্‌ছি, ইন্দু কোথায় একবার দেখ?

সত্যই তো! ইন্দু কোথায়? সকলে তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত বাটী অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু ইন্দুর তো কোন চিহ্নই নাই?

ইন্দু নাই শুনিয়া ইন্দুর জননীর বোধ হইল যেন তাহার সম্মুখের সমস্ত দৃশ্যবস্তু ঘুরিতেছে, তিনি আর কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না; দৃষ্টিশক্তিও যেন ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ যেন

অবশ হইয়া আসিতেছে; অবিলম্বে তিনি ভূমিতে ঢলিয়া পড়িলেন। সকলে তাহার মুখে জলসিঞ্চন করিতে লাগিল।

একহস্তে হ্যারিকেন ও অপর হস্তে লাঠি লইয়া চন্দর দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি বলিলেন—আহা!

কিয়ৎক্ষণ পরে লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতে করিতে তারিণী আসিয়া উপস্থিত। সকলেই সসম্ভ্রমে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। 'এত রাত্রে কিসের গোলমাল হে?' বলিতে বলিতে তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া শঙ্কর যেস্থানে পড়িয়াছিলেন সেইস্থানে আসিয়াই চমকিত হইয়া উঠিলেন—ইস্! এ কি! এ সর্ব্বনাশ কে করলে?

ইন্দুর জননী ভিতর হইতে ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

তারিণী বলিলেন—কেঁদ না বৌমা। আমরা যখন এসে পড়েছি, আর কোনও ভয় নেই।

পরে নিকটে চন্দরকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—চন্দর যে? কতক্ষণ?

চন্দর বলিলেন—এই গোলমালটা শুনেই এসে পড়েছি।

—তাতো এসেছ। কাযটা কা'দের কিছু বল্‌তে পার?

—কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না?

—কাউকে ধরা গেল না?

ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া এমনভাবে চন্দর মস্তক আন্দোলন করিলেন যেন ধরিবার চেষ্টা তিনি রীতিমতই করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই।

গম্ভীরভাবে তারিণী বলিলেন—তাইতো! এর একটা বিহিত তো করা চাই? নয়তো আমাদেরও প্রাণের ভয় হয়ে দাঁড়াল যে? কোন্ দিন নির্ভরে ঘুমুচ্ছি, সকালে উঠে দেখ্‌লুম, কাঁধের ওপর মাথাটাই আর নেই। এমন ডাকাতি তো এগাঁয়ে বড় একটা ছিল না, চন্দর!

চন্দর বলিলেন—তাইতো দেখ্‌ছি।

তারিণী বলিলেন—আচ্ছা, সে যা' হ'বার পরে হ'বে। এখন লোকটাকে তো বাঁচান চাই! ওহে নিতাই, একবার ছুটে উম্‌সের কাছে যাওতো হে। ওই দেখ, দাঁড়িয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চাইছো কি? যাও? বলি লোকটাকে মার্‌বে নাকি হে? মাথা দিয়ে এখনও রক্ত পড়্‌ছে যে!

'এই যাই' বলিয়া নিতাই ডাক্তারের বাড়ী ছুটিলেন।

ডাক্তার আনয়ন করিবার উৎসাহ দেখিয়া চন্দর তারিণীর প্রতি এক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। তারিণী প্রত্যুত্তরে এমন মুখভঙ্গি করিলেন যে, ভাষায় তাহার তর্‌জমা করিলে অর্থ দাঁড়ায়—বলি চন্দর, মুখ বুজে শুধু দেখে যাও যা' করি। বুঝ্‌বে পরে।

উম্‌সে অর্থাৎ উমেশ ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মস্তকে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা হইল। ঔষধের ব্যবস্থাও বাকী রহিল না। দীর্ঘকালপরে শঙ্কর এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে তারিণী সকলকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। শঙ্কর চক্ষু মেলিয়া বিহ্বলদৃষ্টিতে উপস্থিত সকলকে দেখিতে লাগিলেন; এবং অল্পক্ষণ পরেই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—আমার ইন্দু কই?

তারিণী অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্যসহকারে বলিলেন—চুপ্ করহে, চুপ্ কর, আগে সুস্থ হও।

শঙ্কর জোর করিয়া উঠিয়া বসিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না; সর্ব্বাঙ্গ অসহ্য ব্যথায় ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল।

এমন সময় তারিণী অঙ্গন দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন—দেখ ত চন্দর, ওটা কি পড়ে রয়েছে যেন?

চন্দর অবিলম্বে গিয়া বস্তুটী উঠাইয়া লইয়াই, পরক্ষণেই তাহা ভূমিতে

নিক্ষেপ করিয়া ঘৃণাসূচককণ্ঠে বলিলেন—আরে রাম্ রাম্ রাম্! এই রাত্তিরে চান্ করালে দেখ্‌ছি। এযে একটা লুঙ্গি!

তারিণী একটু স্বর চড়াইয়া বলিলেন—বল কি চন্দর! দুর্গে দুর্গতিনাশিনী! মেয়েটাকে তাহ'লে মেলেচ্ছরা, এঁ্যা!—

হতাশভাবে তারিণী মাটীতেই বসিয়া পড়িলেন। উপস্থিত সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল। শঙ্কর পুনরায় সংজ্ঞা হারাইলেন। ইন্দুর জননী মাটীতে আছ্‌ড়াইয়া পড়িলেন—ওগো আমাদের কি হ'ল গো?

তারিণী বলিলেন—যা' হ'বার, তা'তো হ'ল। আর কেঁদে কি কর্‌বে বউমা? এখন শঙ্করটাকে তো বাঁচাতে হবে? ওহে ওষুধ্‌টা দাও তো—

শঙ্করকে ঔষধ সেবন চলিতে লাগিল। তারিণী বলিলেন—ওহে চন্দর, মানুষের এ বিপদে তো একলা ফেলে যাওয়া যায় না! বলি কি, রাত্‌ অনেক হয়েছে, সকলকে বাড়ী যেতে বল। ভিড় করে আর কি হবে? আমি রইলুম্, তুমি রইলে, আর কি?

চন্দর আর বলিবেন কি? তাহাই হইল। একে একে সকলেই প্রস্থান করিল। দুইএকজন প্রতিবেশিনী শুধু ইন্দুর জননীর নিকট রহিল। শঙ্করের নিকট রহিলেন, তারিণী ও চন্দর।

সারারাত্রি জাগরণের পর প্রত্যূষে শঙ্করকে একটু সুস্থ দেখিয়া চন্দর সমভিব্যাহারে তারিণী বাটীর বাহিরে আসিতেই গ্রামের পিয়ন মহেশ মাইতি তাঁহার সম্মুখীন হইল।

তারিণী বলিলেন—কিরে মইসে?

মহেশ বলিল—পেন্নাতঃপেন্নাম্ দাদাঠাকুর। এই মুখুজ্জে ম'শায়ের নামে একটা চিঠি ছিল।

—কোত্থেকে রে?

—এজ্ঞে কোল্‌কেতা থেকে।

'দে—দোব'খন' বলিয়া তারিণী পত্রখানি ঝটিতি হস্তগত করিয়া লইলেন। মহেশ প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান করিলে তারিণী বলিলেন—ওহে চন্দর, এ ভায়ার চিঠি না হয়ে যায় না। চল, দেখা যাক্, কি লিখ্‌ছেন? দরকার হয়, শঙ্করার নামে একটা জবাবও তোমায় মক্সো কর্‌তে হবে, তা' বলে রাখ্‌লুম। আজকের ব্যাপারটা তা'দের না কানে যায়, বুঝ্‌লে?

সোৎসাহে চন্দর বলিলেন—কও কথা! সমুদ্দুর পার হয়ে এসে কি পুকুরে ডুবে মর্‌বো নাকি?

২৭

দিগ্‌গঞ্জ্‌পুরের এই ভয়াবহ ঘটনার কয়েক দিবস পরে একদিন অপরাহ্নকালে নরেন্দ্রনারায়ণবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া নিকটেই উপবিষ্ট হারাণকে বলিতেছিলেন—বৌমার কথায় তো বিশেষ চিন্তিত হ'তে হ'ল হে হারাণ? বিদ্যুৎ আর কনক আমার বুকখানাকে এতদিন ভরিয়ে রেখেছে। আমা হ'তে যদি তা'দের এতটুকু ব্যথা পেতে হয়, তো আক্ষেপ রাখ্‌বার যে আর স্থান পা'বনা ভায়া?

হারাণ বলিলেন—আপনার মত পিতা, মানুষ অনেক ভাগ্যেই পায়। আজ আপনি যা' ভাল বুঝে কর্‌বেন্, ভবিষ্যতে মা বিদ্যুতের আমার তা'তেই মঙ্গল হবে।

নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—ঐ ভাল বোঝা নিয়েই তো আজ যত গোলে পড়েছি হে। বিদ্যুৎ বিয়ে কর্‌বেনা শুনে পর্য্যন্তই আমি ভাব্‌ছি, যে আমার বোঝাটাই আমার মেয়ের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় বোঝা কি

না ? কি জান হারাণ, বুদ্ধি হৃদয়কে উল্লঙ্ঘন করে সব সময় কল্যাণকে ডেকে আন্‌তে পারে কিনা, তাইতেই আজ আমার কেমন সন্দেহ উপস্থিত হচ্ছে।

কথাটা হইতেছে এই যে, নরেন্দ্রবাবুর পূর্ব্বপরামর্শমত হারাণ শঙ্করকে অমূল্যর বিবাহে সম্মতিজ্ঞাপনপূর্ব্বক পত্র দিয়াই, কালবিলম্ব না করিয়া বিদ্যুতের জন্য পাত্র অনুসন্ধান করিতে বিশেষ যত্নবান্‌ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্প্রতি একটী লোভনীয় সম্বন্ধও জুটিয়াছে ; পাত্রটী স্বঘর, সচ্চরিত্র ও স্বাস্থ্যবান্‌ ; বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এম, এ ; বিশেষ অবস্থাপন্ন ; বিজয়মাধবপুরের জমীদারের একমাত্র পুত্র। সন্ধানটী পাওয়া পর্য্যন্ত হারাণের উৎসাহের আর অন্ত নাই। এমন সম্বন্ধ লাখে একটা মিলে কিনা সন্দেহ। এরূপ পাত্র হাতছাড়া হইলে অবশেষে সকলকেই অনুশোচনা করিতে হইবে। এখন শুভস্য শীঘ্রম্‌। হইলে হয় !

কিন্তু অন্নপূর্ণার মুখে দুইএকটী কথা শুনিয়া তাহার বুদ্ধিবিভ্রম হইবার উপক্রম হইয়াছে। বিদ্যুৎ নাকি বলিয়াছে, সে বিবাহ করিবে না। কয়েকদিন ধরিয়া অন্নপূর্ণা তাহাকে যথেষ্ট বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ পাত্রে পড়া যে বিশেষ ভাগ্যের কথা, একমাত্র দুহিতা সুপাত্রস্থা হইলে বৃদ্ধবয়সে স্নেহময় পিতা যে শান্তি লাভ করিবেন, ইত্যাদি অনেক কথাই তিনি বলিয়াছেন ; কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। তিনি যতই বুঝাইতে গিয়াছেন, বিদ্যুৎ ততই কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে। কিছু জিজ্ঞাসা করিলে শুধু বলিয়াছে—সে বিবাহ করিবে না।

ইহাতে অন্নপূর্ণার মনেও একটু সন্দেহের কাল মেঘ উঠিয়াছে ; অতএব তিনি হারাণকে রাত্রে সকল কথাই বলিলেন। হারাণ চিন্তা করিলেন, জননীর মৃত্যুর পর হইতে বিদ্যুৎ কখনও পিতাকে

ছাড়িয়া অন্যত্র যায় নাই; পিতাঅন্তঃপ্রাণ বিদ্যুৎ, স্নেহময় পিতাকে বৃদ্ধবয়সে ত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া হয়তো বিবাহ না করিবার এই বালিকাসুলভ সঙ্কল্প করিয়াছে। কিন্তু নরেন্দ্রবাবু হারাণের মুখে এই সমস্ত শুনিয়া বিশেষ গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছেন। এতাবৎকাল অমূল্যর প্রতি বিদ্যুতের আচরণ তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। বরং ইহাতে তিঁনি আনন্দই লাভ করিতেছিলেন। কারণ অমূল্যকে তিঁনি জামাতাপদে বরণ করিঁবার অভিলাষই পোষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করের পত্রপাঠ করা পর্য্যন্ত, সে সঙ্কল্প জোর করিয়াই তিঁনি ত্যাগ করিয়াছেন এবং হারাণকে কন্যার জন্য পাত্র অন্বেষণ করিতে বলিয়াছেন।

কিন্তু আজ এ হইল কি? মাতৃহীনা কন্যার বক্ষে আজ তিঁনি একি আঘাত করিতে যাইতেছেন? স্বার্থ ত্যাগ করিতে গিয়া আপনার হাতে নিজকন্যাকে তিঁনি আজ বলি দিতে যাইতেছেন যে! দধীচির আদর্শ গ্রহণ করিয়া নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে তিঁনি এতটুকুও ভীত নহেন্। কিন্তু এ যে আর একটী স্বতন্ত্র জীবনের কথা? তাহার ইষ্টানিষ্টের উপর নরেন্দ্রবাবুর কি অধিকার আছে?

হারাণ কিন্তু বিদ্যুতের বিষয় অতখানি জানিতেন না, বা চিন্তা করিয়াও দেখেন নাই। সেইজন্য নরেন্দ্রবাবুর উপস্থিত প্রশ্নটীকে সরল করিয়া আনিবার উদ্দেশ্যেই বলিলেন—যে-বুদ্ধি অন্তঃকরণের অমর্য্যাদা করে, সে-বুদ্ধি তো আপনাতে কখন দেখিনি দাদা?

দীর্ঘনিঃশ্বাসত্যাগ করিয়া নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—দেখনি বলেই বোধ হয়, আজ আমার কাছে এই সমস্যাটাই খুব বড় হয়ে উঠেছে হে! বলি কি ভায়া, বিদ্যুতের কথাটা না হয় কিছুদিন স্থগিত থাক্।

হারাণ শিহরিয়া উঠিলেন—এমন পাত্র যদি হাতছাড়া হয়?

ঈষদ্ধাস্য করিয়া নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—দেখ হারাণ, সকলেরই মত এই সঙ্কীর্ণতারও দুটো দিক্ আছে। একদিক দিয়ে সে ভাঙ্গে, আর একদিক দিয়ে সে গড়ে। একদিক দিয়ে সে বাঁধে, আর একদিক দিয়ে সে মুক্তি দেয়। এখন কথা হচ্ছে, বাঁধন প'রে মুক্তি দোব, না মুক্তি নিয়ে বাঁধন দান কর্‌বো? ভেবে দেখি; তোমার সন্ধ্যাহ্নিকের তো সময় হ'ল? আচ্ছা, যাও, পরে একথা হবে এখন।

হারাণ প্রস্থান করিতে বিদ্যুৎ আসিয়া পিতার কণ্ঠ জড়াইয়া ডাকিল—বাবা!

নরেন্দ্রবাবু গড়গড়ার নল্‌টা তুলিয়া লইয়া বলিলেন—কি মা?

—কাকাবাবুর সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল বাবা?

স্নেহেরকণ্ঠে পিতা বলিলেন—এই কথা হচ্ছিল মা, যে মানুষের একটা জীবন নিয়ে নিজেদের বুদ্ধি যাচাই করা যায় কি না!

—সে কি বাবা?

—অর্থাৎ, মা বিদ্যুৎকে আমাদের বুদ্ধিতে চল্‌তে বাধ্য করাব, না মা'টী আমার নিজের ভালমন্দ নিজে বেছে নেবে?

বিদ্যুতের চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। সে বলিল—আমার ভালমন্দ বেছে কাজ নেই বাবা!

—তাহ'লে যে আমাদের বুদ্ধিকেই জয়মাল্য দেওয়া হ'ল মা?

রাগ করিয়া বিদ্যুৎ বলিল—আমি কি বলেছি, তোমরা বোকা?

হাসিতে হাসিতে নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—বোকা না হ'লেই যে বুদ্ধিমান্ হ'ব তা'রই বা প্রমাণ কৈরে পাগ্‌লী?

এমন সময় দ্বারবান্ আসিয়া কতকগুলি ডাকের চিঠি দিয়া গেল। সেগুলি দেখিতে দেখিতে একখানির উপর তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। দিগ্‌গজপুরের ছাপ্‌ই তো বটে! নিশ্চয়ই শঙ্করের চিঠি!

তিনি বিদ্যুৎকে বলিলেন—দেখ তো মা, তোমার কাকাবাবুর আহ্নিক হ'ল কি না?

কোন জরুরী বৈষয়িক প্রয়োজন অনুমানে বিদ্যুৎ তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। নরেন্দ্রবাবু চিঠিখানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। ভৃত্য আসিয়া কক্ষটীতে সন্ধ্যাদীপ দিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণপরে হারাণ আসিয়া উপস্থিত হইলে নরেন্দ্রবাবু আগ্রহের সহিত বলিলেন—ওহে, বোধ হয় তোমার শাশ্ব্যের চিঠি। পড় ত শুনি।

হারাণ পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রখানি বিশেষ দীর্ঘ নয়। সংক্ষেপেই লেখা। ইন্দুবালার সহিত অমূল্যর বিবাহে হারাণের সম্মতি আছে জানিয়া শাশ্ব্য যে কি পরিমাণে আনন্দিত হইয়াছে, তাহা পত্রে লিখিবার নহে। তবে সম্মুখেই যখন অমূল্যধনের এম, এ পরীক্ষা, তখন উপস্থিত কিছুদিন বিবাহ স্থগিত রাখিতে তাহারও একান্ত ইচ্ছা। বিবাহের গোলমালে তাহার ভবিষ্যৎ না নষ্ট হয়। কথা একরূপ স্থিরই রহিল। উপস্থিত চাষের সংবাদ সুবিধা নহে। একটু অবসর ঘটিলেই কলিকাতায় গিয়া দাদার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসিবার বাসনা আছে, ইত্যাদি। পরে কুশল সংবাদ জ্ঞাপন ও মধ্যে মধ্যে পত্র পাইবার আশা জানাইয়া পত্রখানি শেষ করা হইয়াছে।

লিখিবার ধরণ শুনিয়া নরেন্দ্র বাবুর কেমন যেন একটু খট্‌কা লাগিল। পূর্ব্বপত্রের ন্যায় ইহাতে শাশ্ব্যের সে স্নেহবিগলিত উদার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস কই? সে কাতরতা, সে আগ্রহ কই? এ যেন সচরাচর বরপক্ষীয়ের সহিত কন্যাপক্ষীয়ের যেরূপ কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে, অনেকখানি সেইরূপ। ইহাতে যেন শাশ্ব্যের স্বভাবজাত বিনয়ের মাধুর্য্য ঈষৎ বিকৃত হইয়া তাহার স্বভাবসুলভ সরলতামাখান স্নেহময় আব্‌দার সাধারণ দৈন্য ও অনুরোধে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

নরেন্দ্রবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—শাশ্বাই লিখ্ছে তো?

হারাণ বলিলেন—আজ্ঞে হাঁ। তবে লেখাটা যেন বেশী তাড়াতাড়ি হয়েছে বলে, শাশ্বোর লেখা বলে সহজে ধর্বার উপায় নেই।

শুনিয়া নরেন্দ্রবাবু ভাবিলেন, তাহাই হইবে। তিনি যাহা অনুমান করিতেছিলেন তাহা ভ্রম। সম্প্রতি চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতেই ঐরূপ মনে হইতেছিল।

সুদূর দিগ্‌গজপুরে বসিয়া তারিণী ও চন্দর কিন্তু এই পত্রখানিই প্রেরণ করিয়া খুব একচোট্ হাসিয়া লইয়াছিলেন ও অদূর ভবিষ্যতে আপনাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিশ্চয়তা অনুভব করিয়া ন্যায়বিচারক ভগবানের উদ্দেশ্যে বারবার প্রণাম জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

২৮

মহাকালের তাণ্ডবে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে আমাদের শরীরের প্রতি শোণিতবিন্দুটী নাচিতে নাচিতে প্রতিমুহূর্ত্ত অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে; চলিয়াছে;—অতি সন্তর্পণে, অতি সঙ্গোপনে; যেন নিজের কাছেও নিজে ধরা দিতে চাহে না, পাছে এই নিভৃতযাত্রা নিষ্ফল হয়। জীবজগৎ ও জড়জগতের এই নীরব পাদক্ষেপ কাহার অভিসারে কে জানে? কে সে প্রিয়? আমার জনমের কে সে চিরবাঞ্ছিত? সে কি মৃত্যু? যদি তাহাই হয়, তবে হে আমার মরণ! এস, তোমার শীতল আলিঙ্গনে আমার সকল তাপ জুড়াইয়া দাও!

তুমি আমার প্রিয় নও, ভাবিতেও ভয় হয়। শাস্ত্রে তোমার সহিত মিলনেও আমার বিশ্রাম লেখে না, আরও দূরে টানিয়া লইয়া যায়। সে কোথায়? ওগো কতদূর? আমার প্রতিদিবসকে পিছনে ফেলিয়া, পুরাতন করিয়া অবিশ্রাম এ কোথায় চলিয়াছি?

শঙ্করের বাটীরও সেই কালরাত্রি যে আর প্রভাত হইবে, ইহা আর কাহারও মনে ছিলনা। কিন্তু সে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। তাহার পর দিন আসিয়াছে। সন্ধ্যা হইয়াছে। আবার সেই বিভীষিকাময়ী স্মৃতি লইয়া রাত্রি আসিয়াছে। আবার প্রভাত হইয়াছে। এইরূপে দীর্ঘকাল কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু শঙ্কর মুখুর্জ্জে সেই যে শয্যা লইয়াছেন, আর উঠেন নাই। মহেশ ডাক্তার জ্বর নিবারণ করিতে না পারিয়া, মুখে সাহস দিলেও, মনে মনে বিশেষ শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিতেছিলেন। দিনের বেলায় জ্বরটা একটু কম থাকে, রাত্রে ক্রমেই বেশীমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। যখন একশত তিন ডিগ্রি অতিক্রম করে তখন শঙ্করের মুখে শুনা যায়, শুধু ইন্দুর নাম। তিনি কখন বলেন, এই যে এসেছিস্? যা' ত মা, শুনে আয় ত, দাদারা আজ কল্‌কেতায় যাবেন্ কি না? কখন বলেন, আয় তো ইন্দু। আমার কোলে আয়তো মা! আজ তোকে হাট থেকে পুতুলের কাপড় কিনে দি। কখনও রাগিয়া উঠেন—হুঁঃ খালি খেলা, আর খেলা! সারাদিন মেয়ের নাগাল্ পাওয়া ভার। পরেই আবার ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলেন—তা ভাল, ভাল। অন্নুদি' একলা মানুষ, অমূল্য এসেছে, রান্নাবান্না, এক্‌লা কি পারা যায়? তুই যদি আর একটু বড় হ'তিস্ ইন্দু!

ইন্দুর জননী চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে মাথায় জলের পটি দিয়া বাতাস করিতে থাকেন। শঙ্কর বালকের ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠেন—ইন্দুরে, আয় মা, ফিরে আয়!

গ্রামের যে দুইএকজন প্রতিবেশিনী নিকটে থাকে, তাহারাও এই দৃশ্য দেখিয়া চক্ষের জল রোধ করিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে তারিণী, চন্দর প্রভৃতি আসিয়া খবর লইয়া যান, সাহস দিয়া যান। নিতাইঠাকুর আসিয়া ঘটা করিয়া সিরণী দিবার

জন্য ইন্দুর জননীর নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যও লইয়া গিয়াছেন।

অসুস্থতার অষ্টাদশ দিবসে অপরাহ্নকালে, শঙ্করের জ্বর একটু কম আছে দেখিয়া ইন্দুর জননী তাহাকে দুইতিনটা বালিশ একত্র করিয়া তাহার উপর হেলান দিয়া বসাইয়া একটু সাগু প্রস্তুত করিতে রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহাদের এই বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া গয়লা-বৌ ইদানিং শঙ্করের গৃহেই থাকিত। কিছুক্ষণ হইল সেও শ্রীদাম মুদীর দোকানে কিছু সওগাত করিতে গিয়াছিল।

শঙ্কর সম্মুখস্থ অঙ্গনের দিকে উদাসদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। মনে কত কথাই উঠিতে লাগিল। এখন তাহার মরিতেও ভয় হয়। ইন্দুর মা যে একেবারে একা! নিজের অবর্ত্তমানে তাহার কি হইবে? একথা ভাবিতে গিয়া তাহার হাসি পাইল। তিনি চিন্তা করিয়া কি করিতে পারেন? এই যে ইন্দুর জন্য তিনি কত চিন্তাই করিয়াছিলেন? কেমন করিয়া মেয়েটা সুখী হয়, কেমন করিয়া পাত্রস্থা হয়, কেমন করিয়া অমূল্যর হাতে সমর্পণ করিয়া তাহার ভবিষ্যতের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। এত উদ্বেগ, এত চিন্তাসত্ত্বেও একরাত্রে প্রমাণ হইয়া গেল, যে এই পৃথিবীতে তাহার চিন্তার কোনও মূল্যই নাই। জলস্রোতে ভাসমান্ একটী ক্ষুদ্র পুষ্প যদি হঠাৎ স্থির করিয়া বসে, যে সে আর অগ্রসর হইবে না, অথবা অধিকতর দ্রুত অগ্রসর হইবে তাহা হইলে তাহার প্রতিজ্ঞারও যে মূল্য,-ভবিতব্যের স্রোতে ভাসমান্ শঙ্করের আত্মপ্রচেষ্টা বা চিন্তারও আজ সেই মূল্য।

দেখিতে দেখিতে পশ্চিমদিকের বটবৃক্ষের পশ্চাতে সূর্য্য ডুবিয়া গেল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়ালোক ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল।

গোধূলির ফাগুয়া কখন যে অনিবদ্ধ অন্ধকারে আপনার রঙ্ হারাইয়া ফেলিল, শঙ্কর তাহা আদৌ লক্ষ্য করিলেন না। সহসা অঙ্গনের উপর দৃষ্টিপতিত হইতেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। কে যেন ওখানে মূর্ত্তিমতী বিষাদের মত স্থির, অচঞ্চলভাবে দাঁড়াইয়া না? কে ঐ নারী? হঠাৎ তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া 'ইন্দু! ইন্দু! এলি মা?' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে, মাতালের মত টলিতে টলিতে, দুইচারি পদ অগ্রসর হইয়াই ধূল্যবলুণ্ঠিত হইলেন।

'কি হয়েছে গো—কি হয়েছে গো?' বলিতে বলিতে ব্যস্তসমস্ত হইয়া ইন্দুর মা আলোক লইয়া শঙ্করের নিকট আসিয়া পড়িলেন; —একি? পড়ে গেছ যে! কোথায় যাচ্ছিলে?

তাড়াতাড়ি তিনি তাহাকে ধরিয়া উঠাইতে গেলেন; শঙ্কর কিন্তু অনবরত তাহাকে অঙ্গনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন; কণ্ঠ হইতে তাহার বাক্যনিঃসরণ হইতেছিল না; শুধু একটা অস্পষ্ট জড়িত শব্দ উঠিতেছিল মাত্র।

ভীতান্তঃকরণে ইন্দুর মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বল্ছ, বুঝ্তে পাচ্ছি না যে? একি? তোমার হাত পা নড়্ছে না কেন? একি হোল গো?

বলিতে বলিতে সাহায্যের সন্ধানে তিনি সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিলেন, কে একজন উঠানে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি কাতরকণ্ঠে ডাকিলেন—কে গা ওখানে? একবার এস না গা?

কৈ? সে তো নড়িল না? কে তবে ও? অন্ধকারে পাষাণ প্রতিমার মত দণ্ডায়মানা?

হ্যারিকেন্‌টী হস্তে লইয়া তিনি মূর্ত্তিটীকে সাহায্যের নিমিত্ত আহ্বান করিতে অগ্রসর হইয়াই "এঁ্যা—ইন্দু!" বলিয়া সহসা সভয়ে পিছাইয়া আসিলেন।

ইন্দুর পরিধানে শতছিন্ন মলিন বস্ত্র। রুক্ষ কেশ। ধূলামলিন পদদ্বয়। সর্ব্বাঙ্গে অত্যাচারের চিহ্ন। নয়নের কোনে ঘনকালিমা। কিন্তু চক্ষের সে কি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দৃষ্টি! যেন যুগযুগান্তের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা আজ তাহার নয়নে নামিয়া আসিয়াছে! দেখিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়!

ইন্দু নড়িল না। কথা কহিল না। নিথর, নিশ্চল, দাঁড়াইয়া রহিল।

বক্ষপঞ্জর মথিত করিয়া জননীর মুখ হইতে শুধু নিঃসৃত হইল —উঃ!

আর দাঁড়াইতে না পারিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি মাটীতে বসিয়া পড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে ইন্দুর নয়নদুইটী বহুযুগের সঞ্চিত মর্ম্মভেদী ব্যথায় ভরিয়া গেল। ওষ্ঠাধর ঈষৎ স্ফুরিত হইল।

সে ডাকিল—মা!

ইন্দুর জননীর বোধ হইল যেন কতদূর হইতে ক্ষীণকণ্ঠে শত শত শিশু আজ তাহার ক্রোড়ে আসিবার নিমিত্ত বুকফাটা ক্রন্দনে হাহাকার করিয়া উঠিল।

২৯

গয়লা-বৌ গৃহে প্রবেশ করিয়া ইন্দুর জননীকে তদবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—ওকি গা মাঠান্? ভর্‌সন্ধ্যেবেলা উঠোনের মাঝ্‌খানে অমন করে বসে কেন?

পরে ইন্দুকে দেখিয়াই সে চমকিয়া উঠিল—ওমা! দিদিঠাকরুন্ যে!

ইন্দুর এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে গয়লা-বৌএর মুখে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত বাক্যনিঃসরণ হইল না। গ্রামসুদ্ধ লোক যাহাকে এতদিন খুঁজিয়া ফিরিয়াছে, অথচ কোনও সন্ধানই পায় নাই, আজ হঠাৎ এতদিন পরে, এই ভাবে কে তাহাকে এই সন্ধ্যার অন্ধকারে দিয়া গেল? ইন্দুর জননীর অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া সে অল্পক্ষণেই আপনার বিস্ময় দমন করিয়া ফেলিল। তাড়াতাড়ি সে ইন্দুর হাতখানি ধরিয়া বলিল—তা এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি হবে দিদিঠাকরুন্? বাপ্‌টা যে যায়? একবার দেখ্‌বে চল?

বলিয়া সে ইন্দুর হস্তাকর্ষণ করিল।

এতক্ষণে ইন্দুর জননীর যেন চমক্ ভাঙ্গিল। তিনি গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন—গয়লা-বৌ!

—কি, মাঠান্?

—ওকে ভেতরে নিয়ে যাবি কেমন করে?

গালে হাত দিয়া গয়লা-বৌ বলিয়া উঠিল—নাও কথা মাঠান্! ঘরের মেয়ে এতদিন পরে প্রাণটা নিয়ে ঘরে ফির্‌লো, তা' ঘরে নিয়ে যাব না ত কি রাস্তায় বের করে দোব নাকি?

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ইন্দুর জননী বলিলেন—সব তো বুঝ্‌ছিস্ গয়লা-বৌ?

গয়লা-বৌ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—এতে আর বোঝাবুঝি কি আছে মাঠান্? মেয়েটার পোড়া অদেষ্ট তাই, নয়তো বাছার আমার দোষটা কি শুনি?

বলিতে বলিতে তাহার দৃষ্টি গৃহের ভিতরে শঙ্করের উপর পতিত হইতেই সে বলিয়া উঠিল—ওকি? মাঠান্, ওকি? বাবাঠাকুর অমন করে মেঝেয় পড়ে কেন? এস দিদিঠাকরুন্, শিগ্‌গীর এসো—

বলিয়া ইন্দুকে একরূপ জোর করিয়া টানিতে টানিতে শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইল ও তাহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কিছুক্ষণ ইতিকর্ত্তব্যতা একেবারে ভুলিয়া গেল।

শঙ্কর একদৃষ্টিতে কন্যাকে দেখিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে কি বলিবার জন্য ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, বাক্যস্ফুরণ হইল না; শুধু চক্ষু দিয়া অবিরলধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া গয়লা-বৌও চক্ষের জল চাপিতে পারিল না। অঞ্চলে অশ্রুমোচন করিতে করিতে সে বলিল—দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কি দিদিঠাকরুন্? একবার কাছে যাও?

"কেন, কি হয়েছে রে, গয়লা-বৌ?" বলিতে বলিতে নিত্যনিয়মিতভাবে তারিণী, মহেশ ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ চক্কোত্তি, নিতাইঠাকুর ও ভেলু মণ্ডলও আসিলেন।

তারিণী বলিলেন—একি? এমন ভাবে কেন? দ্যাখোতো হে মহেশ, দ্যাখোতো?

অবিলম্বে মহেশ শঙ্করকে ষ্টেথেস্কোপ্ দিয়া দেখিলেন ও তাহারপর নানাবিধভাবে পরীক্ষা করিয়া শেষে মুখবিকৃত করিলেন।

তারিণী ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিলেন—ব্যাপারখানা কি?

মহেশ শঙ্করের হস্তত্যাগ করিয়া বলিলেন—পক্ষাঘাৎ।

তারিণী লাফাইয়া উঠিলেন—বল কি হে?

মহেশ বলিলেন—আজ্ঞে হাঁ। এখন ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিন্।

শুনিয়াই ইন্দু একেবারে 'বাবাগো' বলিয়া পিতার বক্ষে আছড়াইয়া পড়িল। সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন।

তারিণী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—ইন্দি না?

ইন্দু পিতাকে দুইহস্তে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—ওগো, হ্যাঁগো, আমি সেই কালামুখী ইন্দি গো—। ওগো, তোমরা আমায় মেরে ফেল গো—। আমি রাক্ষসী, তাই বাবাকে খেতে এসেছি গো—!

তাহার সেই কাতরকণ্ঠের আর্ত্তনাদে গৃহের বাতাস পর্য্যন্ত বিষাদভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

সনিঃশ্বাসে তারিণী বলিলেন—দুর্গে দুর্গতিনাশিনী!

গোলমালে অনেকেই আসিয়া পড়িল। শঙ্করকে ধরাধরি করিয়া শয্যায় উঠাইয়া শোয়ান হইল।

এমন সময়ে চন্দর তাহার বিপুল দেহটা লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া তারিণীকে বাহিরে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তারিণী একটু অন্তরালে আসিতেই চন্দর নিম্নস্বরে বলিলেন—দেখেছ ?

তারিণী চতুর্দ্দিক একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিলেন—কা'কে ? ইন্দুকে তো ?

চন্দর জিজ্ঞাসুনেত্রে তারিণীর মুখের প্রতি চাহিলেন।

ঈষৎ হাসিয়া তারিণী বলিলেন—হুঁঃ। এসে পৌঁছে গেছে।

চন্দর একগাল হাসিয়া বলিলেন—তারিফ কর্ত্তে হয় আলিকে। একেবারে কর্ম্ম ফতে। এখন কি খাওয়াবে বল, তারিণী ?

হাসিয়া তারিণী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ চন্দরও আসিলেন।

পিতার পায়ের উপর পড়িয়া ইন্দু তখনও ফঁাপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। গয়লা-বৌ নিকটে বসিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিতেছিল। ইন্দুর জননী স্বামীর মাথার নিকট মর্ম্মর মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়াছিলেন; চক্ষে তাহার পলক পড়িতেছিল না।

তারিণী কণ্ঠস্বরে কতকটা সহানুভূতি মিশাইয়া বলিলেন—আর কেঁদে কি করবি মা ? কপালের গেরো বইতো নয়! নে কাপড়খানা বদ্‌লে আয়। গয়লা বৌ, কচ্ছিস্ কি ? আহা, মেয়েটাকে দেখ্‌লে তোদের দয়াও হয় না রে ? যা—যা, ওকে ঘরে নিয়ে যা। আর তা'ও বলি চন্দর! এই একরত্তি মেয়ে! এরই ওপর কি বিধাতার যত জুলুম্!

নিতাই শিখাশুদ্ধ মস্তকসঞ্চালন করিয়া বলিলেন—উঁহুঃ তারিণী। বিধাতা নয়, বিধাতা নয়। মেয়েটার রাশিচক্রই দোষস্থ। বিধাতা তো আর জ্যোতিষ অমান্য করতে পারেন না ? পূর্ব্বজন্মে যেমন কর্ম্ম করেছে, এজন্মে তেমনি গ্রহচক্রে পড়েছে। পালাবে কোথা ? এ যে শাস্ত্রের লেখন্ হে ?

চক্কোত্তি ঘরের দরজার নিকট বসিয়া ঘন ঘন জানু আন্দোলন করিতেছিলেন। বলিলেন—কর্ম্মফল বৈকি!

নিতাই বলিলেন—নয়? একফোঁটা মেয়ে! কর্ম্ম কর্‌লে কোথায় যে তা'র ফল রে বাপু? ঐ কর্ম্ম হ'ল গিয়ে তোমার গত জন্মের, তার ফল ফল্‌লো এই জন্মে, ম্লেচ্ছগুণ্ডার হাতে। এত যে কেলেঙ্কারী, সেও ছিল তোমার ঐ শাস্ত্রের মধ্যে। কেমন ফল্‌ল তো? শাস্তর মানো না?

মণ্ডল বলিলেন—তা কেলেঙ্কারিটা গড়াল কম নয়। এখন যে যার গঙ্গাস্নান করে বাড়ী ফিরি চল।

তারিণী আকাশ হইতে পড়িলেন! বল কি ভেলু? এদের এই অবস্থায় ফেলে? তাও কি হয়? একটা যা হোক্ ব্যবস্থা করে, সুস্থ করে তবে তো?

তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া চক্কোত্তি বলিলেন—ব্যবস্থা আর কি কর্‌বে তারিণী? এযে একেবারে ম্লেচ্ছের ব্যাপার, দেখ্‌ছো না?

তারিণী কহিলেন—দেখ্‌ছি বই কি, চক্কোত্তি দেখছি বই কি। গাঁয়ের মোড়লি কত্তে হ'লে পিছন দিকেও দুটো চোখ্‌ রেখে চল্‌তে হয়, দেখ্‌বো না?

চন্দর বিশাল ভুঁড়িটীতে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—ওকে অতিবড় শত্রুতেও সে দোষ দিতে পার্‌বে না। তারিণী আমাদের না দেখে কোন কাজ করে না চক্কোত্তি।

তারিণী বলিলেন—না, না। কথাটা হচ্ছে, মেয়েটার অপরাধ কি?

চক্কোত্তি ক্রুদ্ধ হইলেন—অপরাধ নেই কি তারিণী? কই, আগুনে হাত দাও দিকি কেমন না পোড়ে?

তারিণী হাসিয়া বলিলেন—চোট না, চক্কোত্তি, চোট না। হাত পোড়ে, তা'র মলমও আছে। দেখ, মোড়লি কত্তে হ'লে, অনেক ঝক্কিই

সাম্লাতে হয়। তুমি বল্‌ছ তো নেহাৎ অযথা নয়? তা কি বুঝিনা? পরন্তু কথাটা কি জানো? হাজারই হোক্, মানুষ তো আমরা? এই যে মেয়েটা এতদিন পরে ফিরে পাওয়া গেল, খুঁজ্‌তে তো বাকী রাখনি? বলি পেয়েছ? তা যাক্। এল। বাপ্‌টা যায় যায়, পরিবারটা চার্‌ধার অন্ধকার দেখ্‌ছে; বলি, কসাই তো নই? কি বল চন্দর?

চন্দর তৎক্ষণাৎ সায় দিলেন—বিলক্ষণ!

তারিণী বলিলেন—তবেই বল, গাঁয়ের মোড়লি কর্‌ছি বলে তো সকলকে জবাই কর্‌তে পারিনে? তা চক্কোত্তি, অধর্ম্মও হ'তে দেব না, এ আমি বলে দিচ্ছি।

চন্দর বলিলেন—তবে বলি তারিণী। এই গাঁ'টা যে এখনও দাঁড়িয়ে আছে, সে শুধু তোমারই ধর্ম্মে।

তারিণী কহিলেন—তা রাখ্‌বো, চন্দর, তা রাখ্‌বো। ঐ মেয়েটাকে দিয়ে একটা পেরাচিত্তির করিয়ে, দু'চারটী ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে, তবে ছাড়্‌বো। এ তুমি দেখে নিও।

নিতাই বলিলেন—পাপের প্রায়শ্চিত্তই তো বিধি।

চক্কোত্তি দেখিলেন, সকলেই তারিণীর পক্ষে। অতএব, তাহার বিপক্ষে গমন করা যুক্তিযুক্তও নয়, নিরাপদও নয়। চিরকাল তারিণীর সহযোগীতা করিয়া আজ হঠাৎ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে তারিণী তাহাকে ছাড়িয়া কথা কহিবে না।

অতএব তিনি বলিলেন—তা, এ একটা ন্যায্য কথা বল্‌তে হবে বই কি? তাইত বলি, তারিণী কি একটা অশাস্ত্রীয় কাজ কর্‌তে পারে?

তারিণী বলিলেন—দুর্গে দুর্গতিনাশিনী। তা হ'লে নিতাই, আজ কালের মধ্যেই একটা দিনস্থির কর। কি বল?

নিতাই আর বলিবেন কি? তাহাই স্থির হইল।

৩০

বিদ্যুৎ যতই আপন সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে চিরপ্রচলিত মামুলী যুক্তিসকল শুনিতেছিল, ততই তাহার রোখ্ চড়িয়া যাইতেছিল। কেন? বিবাহ যে করিতেই হইবে, এমন কি কথা আছে? বিবাহ করা ব্যতীত স্ত্রীলোকের কি আর অন্য উচ্চতর, যোগ্যতর, বাঞ্ছনীয় কর্ম্ম নাই? অতীত সভ্যতার জরাজীর্ণ কঙ্কালসার দেহখানাই এখনও যাহাদের উপাস্য, স্মৃতিসম্বল সেই হিন্দুজাতি ব্যতীত বর্ত্তমান জগতে কি অন্য সভ্যজাতি নাই? তাহাদের মধ্যে কি সকল স্ত্রীলোকই বিবাহ করে? চিরকুমারী থাকিয়া, সন্তান প্রসব হইতে অন্য কোনও মহত্তর কর্ত্তব্য তাহাদিগের দ্বারা কি সম্পন্ন হইতেছে না? এইরূপ নানাযুক্তি দ্বারা সে তাহার জিদ্ বজায় রাখিতেছিল।

কিন্তু পিতার নিকট হইতে প্রথম যেদিন সে সহানুভূতির স্নেহময় আভাষ লাভ করিল, ঠিক সেইদিন হইতেই তাহার পূর্ব্ব আচরণের

অশোভন ফাঁকগুলা যেন বিশেষ বড় হইয়াই তাহার চোখে ধরা পড়িতে লাগিল। সে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল, যে পূর্ব্বাপর সে যেরূপভাবে চলিয়া আসিয়াছে, তাহা শুধু নাটকেই শোভা পায়; বাস্তব জগতে তাহার নগ্ন বীভৎসতা উপন্যাসের নায়িকার সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠে না।

বিদ্যুৎ তাহার পূর্ব্বআচরিত ব্যবহারের প্রত্যেক ঘটনাটী মনে মনে যতই বিশ্লেষণ করিতে লাগিল, লজ্জায় ততই তাহার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল। ছি! ছি! ছি! কে তাহাকে নির্লজ্জার ন্যায় এই ধনুক্‌ভাঙ্গা পণ করিতে প্ররোচনা দিয়াছিল? বিদ্যুৎ কি সৃষ্টিছাড়া? সমাজের নিয়ম শৃঙ্খলা কি তাহার জন্য নহে? তবে এই অসম্ভব সঙ্কল্প তাহার মনে কেন আসিল?

অন্তরের তমসাবৃত নিভৃতকক্ষে আকুল আগ্রহে সে একটু আলোকের সন্ধানে দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া ফিরিতে লাগিল; সহসা তাহার বুকখানা সজোরে দুলিয়া উঠিল; আপনাকে বিশ্বাস করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। অন্তরের সেই আলোকিত অংশটুকু হইতে জোর করিয়া আপন দৃষ্টিকে ফিরাইয়া লইয়া, ছুটিয়া সে পিতার নিকট গিয়া ভীত শুষ্ককণ্ঠে ডাকিল—বাবা!

নরেন্দ্রবাবু কহিলেন—কিমা?

—তোমারও তো দেখ্‌বার শোন্‌বার জন্যে একজন আপনার লোক দরকার বাবা?

—অভাব কোথায় দেখ্‌লে মা?

—অভাব যে কোথায় নয়, তাও তো দেখ্‌তে পাচ্ছিনে বাবা?

কন্যাকে সস্নেহে আপনার পার্শ্বে বসাইয়া তিঁনি কহিলেন—আমার এমন মা ঘরে থাকতে আবার কোথায় আপনার জন খুঁজতে যাব বিদ্যুৎ?

বিদ্যুৎ একটু রাগতভাবেই বলিল—মেয়ে কি চিরকাল বাপের কাছেই থাকতে পায় ?

নরেন্দ্রবাবু তাকিয়া পরিত্যাগ করিয়া সোজা হইয়া বসিলেন; তীব্রদৃষ্টিতে কন্যার মুখমণ্ডল ক্ষণেকের জন্য নিরীক্ষণ করিলেন; পরে দরদমাখাকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিলেন—ছিঃ মা। সত্যকে বরণ করে নেবার মত সাহসটুকুই যে মনুষ্যত্বের মেরুদণ্ড, সে কথা ভুল্‌লে চল্‌বে কেন ?

বিদ্যুতের চক্ষে জল আসিল; সে বলিল—মিথ্যেকে আমি কোনদিনই মান্‌তে চাইনে।

—আমিও তো তা' মান্‌তে বলিনে মা ? কিন্তু আমারই জীবনে এমন তো অনেক দিনই গেছে, যেদিন সত্যকে মিথ্যে বলে অপমান করেছি, মিথ্যেকে সত্য বলে সত্যের অপলাপ করেছি; কল্যাণ কোনটাতেই হয়নি।

—সকলের ক্ষতি করে যদি একজনের তা'তে কল্যাণ হয়, তাহ'লে সে কল্যাণ আমি চাইনে বাবা।

—প্রকৃত কল্যাণ তো তা' নয় মা ? তুমি তা' চাইবে কেন ?

পিতার মুখের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া বিদ্যুৎ জিজ্ঞাসা করিল—তবে ?

এই ক্ষুদ্র প্রশ্নটী হইতে যেন তাহার অন্তরের আকুল আগ্রহ নিঃশেষে ঝরিয়া পড়িল। সে চাহিতেছিল, তাহার পিতার নিকট হইতে আজ সমস্ত সন্দেহের একটা অকাট্য মীমাংসা। সে চাহিতেছিল এমন একটা অভ্রান্ত সুস্পষ্ট উত্তর যাহার উপর সে একান্তে নির্ভর করিয়া জীবনের পথে নির্ভয়ে চলিয়া যাইতে পারে।

নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—মানুষের হাতে গড়া আদরের জিনিষটীকে প্রকৃত কল্যাণ যে সব সময়ই শ্রদ্ধা করে চলবে, এমন আশ্বাস তো কেউই

দিতে পারে না! একমাত্র অকপটে সত্যের উপাসনাতেই তা'র প্রতিষ্ঠা। তা'তে প্রতিনিয়ত আঘাতকে যে বুক পেতে নিতে হয় তা জানি, কিন্তু ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায়ও যে আমাদের হাতে নেই মা?

পিতার পদধূলি নিজমস্তকে লইয়া বিদ্যুৎ কহিল—আশীর্ব্বাদ করুন বাবা, সেটুকু সাহস ও ধৈর্য্য থেকে আমি যেন কখন বঞ্চিত না হই।

হাস্যোজ্জ্বল মুখে কন্যার মস্তকে সস্নেহে দক্ষিণ হস্তখানি রক্ষা করিতে নরেন্দ্রবাবুর চক্ষু দুইটী সজল হইয়া উঠিল। তিনি স্থির জানিয়া রাখিলেন যে, তাঁহার এই মীমাংসার উপর আজ হইতে বিদ্যুৎ তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ অর্পণ করিয়া দিল।

বিদ্যুৎ সত্যই হৃদয়ে বল পাইল। এমন কি অমূল্যর আশীর্ব্বাদের পর হারাণ যেদিন দিগ্‌গজপুর হইতে ইন্দুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ফিরিলেন, সেদিন যেন সে একটু বেশী প্রফুল্লভাবেই বাটীময় ঘুরিয়া বেড়াইল।

পরদিন অপরাহ্নে অন্নপূর্ণার নিকট কেশবিন্যাস করিতে বসিয়া বিদ্যুৎ সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা কাকীমা, আমোদ আহ্লাদের সময় মুখভার করে থাক্‌তে দেখ্‌লে, মানুষের মনে কি হয় বলুন্ দেখি?

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন—কা'র মুখ ভার দেখ্‌লে মা?

—কা'র নয়, তাই বলুন্? দিগ্‌গজপুর থেকে ইন্দুকে আশীর্ব্বাদ ক'রে কাকাবাবু যে রকম মুখভার করে কাল বাড়ী ফির্‌লেন তা'তে আমারই তো ডাক্ ছেড়ে কেঁদে উঠ্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছিল।

অন্নপূর্ণা বিষণ্ণস্বরে কহিলেন—শুনেছ তো মা, শাশ্মা ঠাকুরপোর অবস্থা? ইন্দুকে অমূল্যর হাতে সঁপে দেবার জন্যেই যেন এখনও—

তিনি আর বলিতে পারিলেন না ; কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল।

বিদ্যুৎ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে কহিল—আচ্ছা কাকিমা, শুন্‌লুম গাঁয়ের লোকেরা ছিল, তাই আশীর্ব্বাদ হয়েছে ; তা আপনারা কেন সেখানে যান্ না ? বিয়েটা চুকে গেলেই আবার চলে আস্‌বেন ?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—ঠাকুরপোর অবস্থা শোনা পর্য্যন্ত সেখানে ফিরে যাবার জন্যে বুকের ভেতরটা আমার তো দিনরাত ছট্‌ফট্ কচ্চে মা ? কিন্তু যাবার যে উপায় নেই !

গ্রামের অন্যান্য লোকের সহায়তায় এই বিবাহ স্থির হইয়াছে। তারিণী প্রকাশ্যে কোন বিরুদ্ধাচরণ না করিলেও দিগ্‌গজপুরে হারাণকে প্রত্যাগত হইতে দেখিলে, এই শুভকর্ম্মের মাঝখানে তিনি যে কখন কি বিঘ্ন উপস্থিত করিবেন তাহা কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। বিদ্যুৎ ইহা জানিত। কিন্তু কি করিলে যে, সে তাহার এই স্নেহের কাকিমাটীর মনটীকে হাল্‌কা করিয়া অমূল্য বাবুর আগামী বিবাহ উৎসবে উৎসাহিত করিয়া তুলিতে পারে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সে এমন সব কথাই তুলিতেছিল যে তাহাতে অন্নপূর্ণাও যতখানি ব্যথা পাইতেছিলেন সেও তাহার অপেক্ষা কম দুঃখ পাইতেছিল না।

অন্নপূর্ণার প্রারব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল ; সযত্নে বিদ্যুতের ললাটে একটী সিন্দুরটিপ্ দিয়া অন্যমনে তিনি প্রস্থান করিলেন।

একটা কিছু করিবার অভিপ্রায়ে ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে কিছুক্ষণ পরে বিদ্যুৎ, অমূল্যর পাঠকক্ষটীতেই আসিয়া প্রবেশ করিল এবং হারাণকে চিন্তানিবিষ্ট দেখিয়া ধীরে ধীরে তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি ভাব্‌ছেন কাকাবাবু ?

হারাণ সচকিত হইয়া বলিলেন—কই না ?

বিদ্যুৎ হাসিয়া কহিল—তবে কি একলা চুপ্‌টি করে বসে কড়িকাঠ গুন্‌ছিলেন ?

হারাণও ঈষদ্ধাস্য করিলেন। বিদ্যুৎ নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল—ভেবে ভেবে যে মাথার চুলগুলো পাকিয়ে ফেল্লেন্ কাকাবাবু ? দাঁড়ান্, এই সাম্‌নের ক'টা ততক্ষণ তুলে দি।

বিদ্যুৎ হারাণের অর্দ্ধশুভ্র মস্তক হইতে একটী একটী করিয়া পক্ককেশ তুলিতে লাগিল। হারাণ সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরে বিদ্যুৎ বলিল—আচ্ছা কাকাবাবু, পক্ষাঘাত কি মারাত্মক অসুখ ?

—কি করে বল্‌ব মা ?

—কেন ? বাবা যে ডাক্তার পাঠিয়েছিলেন তিনি কি বলেন ?

—তা' তো এখনও শুনিনি। অমূল্য তাঁর কাছে গেছে ; আজই জান্‌তে পারব।

—আপনি দেখ্‌বেন ডাক্তারে কখনও তা বলবে না।

—বল্‌লেই বা আমরা কি কর্‌তে পারব ? এমনভাবে বেঁচে থাকাও তো সুখের নয় ?

হারাণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বিদ্যুৎও কিছু বলিতে পারিল না।

পরে হারাণ বলিলেন—এখন যদি তা'র কপালে থাকে তবেই দু'হাত এক হওয়া দেখে যেতে পার্‌বে!

বিদ্যুৎ ভ্রমক্রমে হঠাৎ একটী অপক্ক কেশ তুলিয়া ফেলিল এবং অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—ঐ যাঃ। লাগ্‌ল কাকাবাবু ?

হারাণ বলিলেন—কৈ না ? লাগ্‌বে কেন ?

বিদ্যুৎ অপক্ক কেশটি হারাণকে দেখাইয়া বলিল—তবে এটা বোধ হয় মনে মনে পেকে উঠেছে, আমরা জান্‌তে পারিনি, না কাকাবাবু?

হারাণ হাসিলেন। বিদ্যুৎ একটু বেশী করিয়াই হাসিতে লাগিল। এমন সময় অমূল্য কতকগুলি নূতন স্কুলপাঠ্য পুস্তক লইয়া প্রবেশ করিল।

হারাণ তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ডাক্তার কি বল্লেন অমূল্য?

পুস্তকগুলি টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে অমূল্য বলিল—এখন তেমন ভয়ের কিছু নেই।

বিদ্যুৎ বলিল—দেখ্‌লেন কাকাবাবু? আপনি মিছে মিছে ভেবে সারা হচ্ছেন।

হারাণ ঈষৎ প্রসন্নমুখে বলিলেন—তোমার কথা কি মিথ্যে হতে পারে মা? দাদাকে খবর দিয়ে এসেছিস্ অমূল্য?

অমূল্য বলিল—এখনও তাঁর কাছে যাইনি। বইগুলো রেখে যাই।

"না—না—আমিই যাচ্ছি। তিনিও ভাব্‌ছেন্—।" বলিয়া হারাণ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন।

অমূল্য কনকের ক্লাশ প্রমোশনের নির্দ্ধারিত পাঠ্যপুস্তকের তালিকাখানি বাহির করিয়া বিদ্যুৎকে কহিল—ইংরাজীখানা এখনও ছেপে আসেনি। আর সব বই কেনা হ'য়ে গেছে।

সে তালিকাখানি বিদ্যুৎকে দিল। বিদ্যুৎ তাহা উল্টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—সরকার মশাইকে না দিয়ে নিজে কেন কষ্ট কর্‌তে গেলেন্?

অমূল্য কহিল—কষ্টের কথা কেন বল্‌ছেন? কনক ক্লাশে উঠ্‌ল, এতে তো আমার আনন্দ হ'বার কথা!

বিদ্যুৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—বরং একটা দিন একটু বিশ্রাম কর্‌লেই এখন আমরা বেশী আনন্দ পাই।

বিদ্যুতের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে অমূল্য ঈষৎ লজ্জিত হইল।

কিন্তু কহিল—পরিশ্রমের সম্ভাবনা থাক্‌লে তবে তো বিশ্রাম চাইব ?

বিদ্যুৎ কোমলকণ্ঠে বলিল—সম্ভাবনাটা কি সকলের চোখে সব সময়ে ধরা পড়ে ? তাহ'লে সময় থাক্‌তে সকলেই তো সাবধান হ'য়ে যেতে পার্‌ত অমূল্যবাবু ?

নিজের কথার সম্পূর্ণ অর্থ উপলব্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষের দিক্‌টায় বিদ্যুৎ জোর করিয়া 'অমূল্যবাবু' বলিল।

বিদ্যুতের মুখে অমূল্য যতদিন নিজের নাম শুনে নাই ততদিন তাহার কিছুই মনে হয় নাই। আজ কিন্তু তাহার মুখে 'অমূল্যবাবু' শুনিয়া অমূল্য চমকিত হইল। তাহার যেন কেমন করিয়া মনে হইল, এতদিন বিদ্যুতের নিকট তাহার একটী বিশেষ আসন পাতা ছিল, যেস্থান হইতে সে এখন নিজের অজ্ঞাতসারেই দূরে সরিয়া যাইতেছে।

অমূল্য আহত হইয়া বলিল—সাবধান হ'য়েই বা লাভ কি বলুন্ ?

বিদ্যুৎ বলিল—অন্ততঃ দুঃখের সঙ্গে ঝগ্‌ড়াঝাটি করে আর দিন কাটাতে হয় না।

—কিন্তু যার কপালে দুঃখ আছেই ?

—কপালের লেখা তো মানুষে পড়্‌তে পারে না ?

—আন্দাজ তো কর্‌তে পারে ?

—তা পারে, কিন্তু তাতে কতক্‌টা ভুল থেকে যায়।

—কিন্তু কতক্‌টা তো সত্যিও থাকে ?

সন্দিগ্ধভাবে বিদ্যুৎ অমূল্যর মুখের পানে চাহিল। পরে কহিল—আপনি কি বল্‌তে চান্ বলুন্ তো ?

অমূল্য এতক্ষণ অনেকখানি নিজের সঙ্গেই কথা কহিতেছিল। হঠাৎ বিদ্যুতের এইরূপ অভিনব প্রশ্নে নিদ্রিত ব্যক্তি যেন কাহারও এক সজোর চপেটাঘাতে উঠিয়া বসিল।

অমূল্যর বিহ্বল দৃষ্টি দেখিয়া বিদ্যুৎ ব্যথাও পাইল, আনন্দও বোধ করিল; কিন্তু মুখভাবে কোনটাই প্রকাশ না করিয়া অভিযোগের স্বরে সে কহিল—এ কিন্তু আপনার ভারি অন্যায় অমূল্যবাবু। অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে আপনার মত সকলেই তো আর নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাকৃতে পারে না?

অমূল্য হাসিয়া কহিল—না থেকেই বা উপায় কি বলুন্?

বিদ্যুৎও ঈষৎ হাসিয়া বলিল—উপায় আছে, যদি এই সাম্‌নের সাতটা দিন যেমন বলি তেমনি ভাবে চলেন।

অমূল্য বলিল—বেশ, আমি রাজী।

শুনিয়া বিদ্যুৎ ঈষৎ লজ্জিতা হইল; কিন্তু এই লজ্জায় সে বিশেষ দুঃখিত হইল না; বরং ইহাতে যে আনন্দের ক্ষীণ আভাষটুকু আসিল তাহাতেই সে অধিকতর ব্যথা পাইল।

শুধু রহস্যের শেষ সুরটুকু অক্ষুন্ন রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এখন থেকেই নাকি?

—এখন থেকেই। এবং যতদিন বাঁচ্‌ব।

বিদ্যুৎ কথাটা ঘুরাইয়া দিয়া বলিল—তবে যান্, হাত পা ধুয়ে আসুন্, আমি গিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিই।

বলিয়া বিদ্যুৎ অশ্রুগোপন করিয়া ব্যস্ত হইয়া প্রস্থান করিল। সে সত্যকে বরণ করিয়াছিল বটে কিন্তু দুঃখকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই।

৩১

শঙ্করের বাটীতে ইন্দুর বিবাহ উপলক্ষে তারিণী যেরূপ বুক পাতিয়া দাঁড়াইলেন তাহা দেখিয়া হারাণ পর্য্যন্ত বিস্মিত না হইয়া পারিলেন না। বরবেশে অমূল্যকে লইয়া হারাণ যখন বিপন্ন ও অসহায় শঙ্করের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন আজন্মের শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া, কোমরে গামছা জড়াইয়া তারিণী ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—আয়রে হারাণ, আজ আর তোর বরকর্ত্তা সেজে আসরে বসে থাকলে চল্‌বে না। আজ বরযাত্তর বল্‌তেও যারা, কন্যেপক্ষ বল্‌তেও তা'রা। আমাদের দু'জনকেই সব দেখে শুনে নিতে হবে; তা বলে দিচ্ছি।

এবং অবিলম্বেই অমূল্যর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া যাইতে যাইতে তিঁনি ভারিগলায় বলিলেন—আর আজ এমন দিনে কিনা শাল্যাটা রইল বিছানায় পড়ে! এই কি ভগবানের বিচার?

বাপ্ থাকতে কিনা আমায় সম্প্রদান করতে হোল?

বলিতে বলিতে তিঁনি বামহস্ত দিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন।

সেই রাত্রে শুভক্ষণে তিঁনি আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃতা ইন্দুকে রীতিমত মন্ত্র পাঠ করাইয়া অমূল্যর হাতে সঁপিয়া দিলেন। ইন্দুর জননীর ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল দেখিয়া গ্রামের প্রতিবেশিনীগণই স্ত্রী-আচার সম্পন্ন করিলেন।

এইরূপে নানা গণ্ডগোলের মধ্য দিয়া অমূল্যর সহিত ইন্দুর বিবাহ হইয়া গেল; হারাণ শঙ্করের অবস্থা দেখিয়া অশ্রু গোপন করিয়া বর ও কন্যা সহ কলিকাতায় রওনা হইলেন।

চন্দর কিন্তু এই বিবাহ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া একরূপ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন; এবং এতদিন পরে মনে মনে তিনি তারিণীর বুদ্ধির নিকট সত্য সত্যই পরাভব স্বীকার করিলেন।

হারাণকে সমাজচ্যুত করিয়া ভিটাছাড়া করিবার কারণটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইতে বিশেষ বুদ্ধির আবশ্যক হয় না। তাহারপর শঙ্কর যখন তারিণীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাঠিহস্তে ছুটিয়া আসিয়াছিল তখন তাহাকেও যে ঐ শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? শঙ্করের তাহাতেও যখন চৈতন্য উদয় হইল না, এমন কি ভোলানাথের বিবাহ সম্পর্কে তাহাদের যখন সকলকেই সে রীতিমত অপমান করিল তখন আলিমিঞার সাহায্যও যে গ্রহণ করিতে হইবে ইহাও সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু তাহার পর হইতে যে সকলই সমস্যাপূর্ণ হইতে চলিয়াছে? ম্লেচ্ছদিগের নিকট হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া ইন্দুর গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত তারিণী তাহার নিকট এতই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছেন যে চন্দরের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তিও আর হতবুদ্ধি না হইয়া পারেন নাই।

অতএব এক্ষণে বিশেষ অভিমানের স্বরেই তিনি কহিলেন—বলি তারিণী, এই কি তোমার আক্কেল্?

বরকন্যা বিদায় করা পর্য্যন্ত তারিণীর মন বিশেষভাবেই প্রফুল্ল ছিল; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন?

চন্দর বলিলেন—আর কেন? বলি সেই যদি ওদের জাতে তুলে, বিয়ে থা দিয়ে ঘরসংসারি করবে, তবে আর এতদিন ধরে আমাদের নাকে পাক্ দিয়ে ঘুরোলে কেন?

তারিণী সহাস্যে বলিলেন—কি বল্‌ছো চন্দর?

—বল্‌ছি ঠিক। এখন সব ব্যবস্থাই যখন হ'ল, তখন আর কেন? চল, এইবেলা গিয়ে কাশীবাস করা যাক্, নয়তো কোন্‌দিন ঐ ভাড়াকরা গুণ্ডা আলিটার ব্যাপারই হয়ত ফাঁস্ হয়ে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে শ্রীঘর বাস করে আমাদের কাশীবাসের খেদ মেটাতে হবে।

শুনিয়া তারিণী আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। হা হা করিয়া উচ্চহাস্য দ্বারা চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন। চন্দর বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তারিণী সমভাবে হাসিতে হাসিতে তখন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা চন্দরকে সম্মুখস্থ পথ দেখাইয়া দিলেন।

চন্দর দেখিলেন, নিতাই ও মণ্ডলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গয়লা-বৌ আসিতেছে; কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তিনি অবাক্ হইয়া রহিলেন।

গয়লা-বৌ গৃহে প্রবেশ করিয়া তারিণীকে প্রণাম করিতেই তিঁনি বলিয়া উঠিলেন—এসব কি কাণ্ডকারখানা বল্‌তো গয়লা-বৌ?

নিতাই ও ভেলু মণ্ডল বিস্মিত হইলেন; তাহারা একযোগেই বলিয়া উঠিলেন—তাহ'লে তোমার কানেও গেছে নাকি খুড়ো?

তারিণী বলিলেন—যাবে না? একি যে সে কথা নিতাই? সাধে কি গয়লা-বৌকে ডেকেছি? একবার ওর মুখেও শোনা চাইত?

গয়লা-বৌ শুনিয়া চৌকাঠের উপর উবু হইয়া বসিয়া কহিল—তবে শোন বলি বাবাঠাকুর। সেই যে রাত্তিরে ফিরে এল, তা'র দু'চার দিন পরে মেয়েটা আমায় বল্লে কি না, গয়লা-বৌ, আমার গা বমি বমি কচ্ছে। আমি মনে করনু বুঝি কোন ব্যারাম হোল! ওমা তা না! বল্‌লে পেত্যয় না যাবে, এই তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি বাবাঠাকুর, এই এক একটি করে সব নক্ষণগুলিই পেকাশ পেলে। একি লুকোবার গো?

তারিণী বলিলেন—আমি তো আর অন্দরে ঢুক্‌তে পারিনে গয়লা-বৌ? হ্যাঃ, সে থাক্‌তিস্ তুই, তো বুঝ্‌তুম। তা তুইও সময় বুঝে মেয়ের শশুরবাড়ী গেলি। কি করি বল্? মেয়েটা চুরি গেল, বাপ্‌টা শয্যেশায়ী হয়ে পড়্‌ল, বাঁচে কি না বাঁচে! মনটা কেমন বিগ্‌ড়ে গেল, মাগীর কান্না দেখে ভুল্‌লুম। ভাব্‌লুম, আহা, মানুষের বিপদে মানুষে না দাঁড়ালে আর কে দাঁড়াবে? তার কি এই শাস্তি রে গয়লা-বৌ?

গয়লা-বৌ হুম্‌কি দিয়া উঠিল—আহা'র নিকুচি করেছে! কলিকালে কি আহা কর্‌তে আছে বাবাঠাকুর? একপাত্ করে লুচি দিয়ে মাগী গাঁ শুদ্ধ্ মজালে গো! কতদিন মেয়েটাকে দেখিনি, তাই পনেরটা দিনের তরে গাঁ ছাড়া হয়েছি কি অম্‌নি এই জাত্ খাবার কাণ্ড! কাণ্ড বলে কাণ্ড! একেবারে দু'তিন মাস, বাবাঠাকুর? এই হাঁড়েফাঁড়ে পেট্! তা আর হবে না? ষোল সতেরো বছরের মেয়ে ঘরে পুষে রাখা! তখনই বলেছিলুম, ঠাকুরমেসো আর নয়। ধাড়ি হোলো, ইন্দির একটা কিনেরা করো। কেমন? এই গরীবের কথা ফল্‌ল তো? মেলেচ্ছের হাতে জাত্ খোয়ালি তো? মর্—মর্!

বলিয়া গয়লা-বৌ নথসমেত মুখখানা বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া লইয়া চুপ্ করিয়া রহিল।

তারিণী আক্ষেপের স্বরে বলিলেন—তাওতো পেরাচিত্তির করে জাতে তুল্লুম গয়লা-বৌ! তার কি এই ফল? সেই তো ঢি ঢি পড়ে গেল? আজ না হয় কাল অমূল্যদের কানে তো উঠ্বে? তবে এই বুড়ো হাড়ে লুচির ধামা কেন বওয়াতে গেলি মাগী?

গয়লা-বৌ বলিয়া উঠিল—সয়তান্, মাগী সয়তান্। সে ভাল মানুষের বাছাকেও নরকে ডুবুলি, মেয়েটারও গলায় পা' দিলি? পাঁচজনের জাত্ খেয়ে তোর ভাল হবে? ধম্ম নেই? দিনরাত্তির হচ্চে না? না—বাবা ঠাকুর, ব্যাগত্যা করে বল্ছি, আর ওখানে থাক্তে আমায় আজ্ঞে কোর না। এতদিন না বুঝেই ওখানে ছিলুম্। গতর খাটাব খাব। তা'বলে জাতধম্ম তো দিতে পার্বোনি?

গয়লা-বৌ জানিত না যে কলিকাতা হইতে নরেন্দ্রবাবুর অনুরোধে হারাণ একটী দাসী আনিয়া শঙ্করের বাটীতে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

নিতাই বলিলেন—বাপ্রে! তা'কি আর হয়? শাস্ত্রে বলে জেনে শুনে পাপ করলে তার প্রায়শ্চিত্ত নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা। মানে, তার আর গতি নেই, গতি নেই। ম'লে মুখে আগুন দাও, তার মুখও পুড়্বে না।

গয়লা-বৌ শিহরিয়া উঠিল—তবেই বল বাবাঠাকুর?

তারিণী বলিলেন—নাঃ। তা'কি আমি আর তোকে বল্তে পারি? কে জানে, ভেতরে ভেতরে এত! আচ্ছা, এই তো শুনলুম, এবার দেখি এর কি কর্তে পারি।

দীর্ঘ প্রণামান্তে আপনমনে বকিতে বকিতে গয়লা-বৌ পরকালের একটী কিনারা করিয়া বিদায় লইল। ভেলু এবং নিতাইও তাম্রকূট

সেবন করিয়া একে একে প্রস্থান করিলেন। চন্দর এতক্ষণ অবাক্ হইয়া শুনিতেছিলেন। এক্ষণে ভক্তিগদগদচিত্তে তারিণীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

তারিণী সহাস্যে কহিলেন—এর জন্যে আবার নগদ একটী শ' টাকা আলি মিঞাকে গুনে দিতে হয়েছে হে চন্দর, বুঝলে ?

বলিয়া তিনি একটী কটাক্ষ করিলেন।

৩২

আর তো চক্ষে জল আসে না! ইন্দুর অশ্রুর উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সে কাঁদিয়াছে অনেক। সহসা মধ্যরাত্রে মুসলমান আততায়ীগণ যখন তাহাকে পিতামাতার ক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া পলায়ন করিল, তখন সে কাঁদিয়াছে। দুর্ব্বৃত্তদিগের গৃহে আবদ্ধ থাকিবার কালে সে প্রত্যহ তাহার মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে ভূমিতল সিক্ত করিয়াছে। কিছুদিন পরে পুনরায় সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন তাহারা সন্তর্পণে তাহাকে গৃহের দ্বারে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখনও সে কাঁদিয়াছে। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্নেহময় পিতার শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া সে কাঁদিয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত করিবার কালে সে কাঁদিয়াছে। হারাণ যখন তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন, তখনও সে কাঁদিয়াছে।

চক্ষের জলে বক্ষ তাহার ভাসিয়া গিয়াছে কিন্তু সংসারের তাহাতে কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইয়াছে? পুরাকালে তাহারই অশ্রুর অভিশাপে প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি সবংশে নিধন হইয়াছে; কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে

তাহার অশ্রুজলে কাহার কি যাইল, আসিল ? আকাশে তেমনই সূর্য্য উদিত হইতেছে, তেমনই চন্দ্র হাসিতেছে, তেমনই নক্ষত্র জ্বলিতেছে। পৃথিবীতে তেমনই অন্যায়ের অভিযান চলিতেছে, অত্যাচারের বিপুল বিক্রম দৃষ্ট হইতেছে ; হৃদয়হীন স্বার্থের যূপকাষ্ঠে মনুষ্যত্ব ছিন্নশির লইয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। ছিন্নমস্তার শোণিতধারায় আজ জাগ্রত দানবের বিজয়োল্লাস উঠিতেছে ! কাঁদিয়া কি হইবে ?

আজ ইন্দুর ফুলশয্যা। বিদ্যুৎ সারাসন্ধ্যা বসিয়া বসিয়া ইন্দুকে ফুলের সাজে সাজাইয়াছে। মাথায় তাহার ফুলের মুকুট পরাইয়া দিয়াছে ; কর্ণে তাহার ফুলের দুল দুলাইয়াছে ; কণ্ঠে তাহার ফুলের মালা পরাইয়াছে ; হস্তে তাহার ফুলের বলয়, ফুলের বাজু বাঁধিয়াছে। তথাপি তাহার মনের মত হয় নাই। পুনরায় সমস্ত আভরণ খুলিয়া ফেলিয়া ইন্দুকে নূতন করিয়া সাজাইয়াছে। নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার ন্যায় বসিয়া বসিয়া ইন্দু অর্থশূন্য দৃষ্টিতে বিদ্যুতের কার্য্যকলাপ দেখিয়াছে। হাসে নাই, কথা কহে নাই, বুঝিবা কিছু ভাবেও নাই। অপলকনেত্রে শুধু দেখিয়াছে। বহুক্ষণ ধরিয়া ইন্দুকে সযত্নে সজ্জিতা করিয়া অবশেষে বিদ্যুৎ ইন্দুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চমকিতা হইয়া উঠিয়াছে। এই কি সেই ইন্দু ? না তাহার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছে ? সেই চক্ষু, সেই মুখ, সেই কেশ, সেই সব ; অথচ ইহার যেন কি নাই যাহার জন্য ইহার নিকট হইতে পূর্ব্বের জীবন্ত ইন্দু চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে ; রাখিয়া গিয়াছে শুধু তাহারই একটা বিকৃত ছায়া। এ যেন মনোমুগ্ধকারী সঙ্গীতের একটু বেসুরা রেশ !

সে সময় ইন্দু যদি বিদ্যুতের মুখভাব দেখিতে পাইত তাহাহইলে সেও অল্প বিস্মিতা হইত না। কিন্তু তখন তাহার দেখিবার সে দৃষ্টি ছিল না।

রাত্রে ইন্দু সুসজ্জিত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, যন্ত্রচালিত জড় পদার্থের ন্যায়। বিহ্বল দৃষ্টিতে সে চতুর্দ্দিক দেখিল। সম্মুখে ফুলশয্যা। স্তবকে স্তবকে নানা বর্ণের, নানা গন্ধের ফুল সেখানে প্রস্ফুটিত। আকুল আগ্রহে আকণ্ঠ পিপাসা লইয়া তাহারা যেন কাহাকে নিকটে আহ্বান করিতেছে। ইন্দুর মনে হইল, এ যেন কাহার গৃহে কে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। অধিকার অনধিকারের প্রশ্ন তাহার মনে উদয় হইল না। সে যেন একজন সম্পূর্ণ পৃথক্ তৃতীয় ব্যক্তি। সে যেন আজ রাত্রে মহানাটকের এক করুণ দৃশ্যের দর্শকমাত্র।

ইন্দু শয্যায় উঠিল না; ধীরে ধীরে মেঝের উপরই বসিয়া পড়িল।

কতক্ষণ সে এইভাবে বসিয়া রহিল তাহা সে জানিতেও পারিল না। হঠাৎ কাহার পদশব্দে সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে অমূল্যর প্রসন্ন মূর্ত্তি! ললাট তাহার চন্দনচর্চ্চিত, বক্ষে তাহার ফুলেরমালা এখনও মন্ত্রতুষ্ট সামাজিক দাবীর সাক্ষ্যদান করিতেছে। কক্ষের দ্বার অর্গলবদ্ধ; নির্জ্জন গৃহে মাত্র দুইটী প্রাণী; আর কেহ নাই। ইন্দুর বোধ হইল, ঐ আজন্মপরিচিত মনুষ্যটী হইতে আজ সে কত দূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের মধ্যে আজ যেন এক মহাসমুদ্র ব্যবধান সৃজিত হইয়াছে!

অমূল্য ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আসিয়া বলিল—ইন্দু! মেঝেয় বসে কেন?

নিজের অজ্ঞাতসারে ইন্দু এতক্ষণ সভয়ে ইহারই অপেক্ষা করিতেছিল। এক্ষণে ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; মস্তিষ্ক সজোরে দুলিতে লাগিল। সে পালঙ্কের পার্শ্বেই বসিয়াছিল; এক্ষণে দুইহস্তে তাহার বাজু চাপিয়া ধরিয়া আপনাকে সংযত করিবার প্রয়াস পাইল।

অমূল্য অতখানি লক্ষ্য করিল না। সাদরে তাহার হস্তধারণ করিয়া ডাকিল—ইন্দু!

চকিতে আপনার হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া ইন্দু কঠোরস্বরে কহিল—সরে যাও—ছুঁও না!

অমূল্য হতবুদ্ধি হইয়া ইন্দুর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহা দেখিয়া ইন্দু আহতা হইল। কিন্তু অবিলম্বে কণ্ঠস্বরে ব্যথার কণামাত্র প্রকাশ না করিয়া অধিকতর নির্ম্মমভাবে সে বলিল—তুমি কি চাও?

অমূল্যর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে পূর্ব্ববৎ নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ইন্দু বলিল—এই দেহটা? আর তা দেবার উপায় নেই। কোনরকমে নেই। মনটাকেও নাড়া দিয়ে দেখেছি; সেখানেও ছোঁয়াচ্ লেগেছে। সেখানেও এত ময়লা জমে উঠেছে যে তার দুর্গন্ধে মাঝে মাঝে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। আর আমার কি আছে যে তা তোমায় ধরে দেব? আজ আমি নিঃসম্বল। বল না? চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বল না? আর আমার কাছে কিসের আশায় এসে দাঁড়িয়েছ?

অশ্রু আর রোধ মানিল না। মেঝের উপর উপুড় হইয়া অভাগী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এই সেই ইন্দু? এত কথা এ কোথা হইতে শিখিল? এ সব সে কি বলিল?

অমূল্য ডাকিল—ইন্দু!

ইন্দু কোনও উত্তর দিল না। তেমনি পড়িয়া রহিল।

অমূল্য কাতরকণ্ঠে বলিল—ইন্দু, আমি কিছু বুঝ্তে পার্ছি না!

যুদ্ধে আহত বীর যেমন শেষ আঘাত গ্রহণ করিবার জন্যই প্রাণপণ

শক্তিতে উঠিয়া দাঁড়ায়, ইন্দুও সেইরূপ উঠিয়া বসিল। নিষ্প্রভ গণ্ডদেশ তখনও তাহার অশ্রুসিক্ত; চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ; কপোলের দুই পার্শ্বের শিরাদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।

সে বলিতে লাগিল—আর যাই হোক্, তোমার কাছে তো কখন ফাঁকি রাখ্‌তে পার্‌ব না? আজ তোমায় সব কথাই বুঝিয়ে বল্‌ব। কিছু গোপন কর্‌ব না। কিন্তু যত আঘাত্‌ই পাও, শেষপর্য্যন্ত তোমায় শুন্‌তে হবে। এতদিন কেউ আমার কথা শোনেনি; বল্‌তে গেলেও বল্‌তে দেয়নি: মুখ চেপে ধরেছে। পাছে গোলমাল হয়, সেইজন্যে মা'কে পর্য্যন্ত কেউ কথাটী কইতে দেয়নি।

নিঃশ্বাস লইবার জন্য ইন্দু একটু থামিল। পরে যেন আপনমনেই বলিতে লাগিল—লোকে বলে পেরাচিত্তির কর্‌লে শুদ্ধ হয়। তবে আমি শুদ্ধ্ হলুম্ না কেন? যেমন করে মন্তর বল্‌তে বলেছিল তেমনি করেই তো বলেছি? বল্‌লে, অনুতাপ কর্‌তে হবে। কই, তাও তো পাল্লুম্ না? মনকে কত বুঝিয়ে বল্লুম্ যে, দোষ তো হয়েছে; পাপ তো করেছি; অনুতাপ না করলে চল্‌বে কেন? তা মন সায় দিলে না। তারিণী মেসোকে কেঁদে সব মনের কথা বল্লুম্। তিঁনি বল্লেন্, তোর অপরাধ কি? ম্লেচ্ছ গুণ্ডারা যে তোকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল, তা'কি আর ভগবান দেখ্‌তে পাচ্ছে না? আমিও তো তাই ভাবি। কিন্তু ভগবান কি কুলটার কথা শোনেন্? ওকি? ওকি? চলে যাচ্ছ যে? সব যে এখনও বলা হয় নি—?

ইন্দু উঠিয়া দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই অমূল্য মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে গৃহের বাহির হইয়া গেল। ইন্দু চিত্রার্পিতার ন্যায় বসিয়া রহিল। চক্ষে তাহার পলক নাই; দেহে তাহার স্পন্দন নাই। মুহূর্ত্তের জন্য সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি তাহার সম্মুখে যেন মসীময়ী অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

৩৩

দূরে একটা ঘড়িতে বারটা বাজিয়া গেল। কলিকাতার দোকান সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শুধু মধ্যে মধ্যে এক একটা পানের দোকান তখনও খোলা রহিয়াছে; এবং যানবাহনশূন্য প্রশস্ত রাজপথের ধারে ধারে গ্যাস্‌পোষ্টগুলা সুপ্ত নগরীর বুকের উপর সারি দিয়া দাঁড়াইয়া যেন তখনও কোনও অতীত মহোৎসবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দূর হইতে মধ্যে মধ্যে দ্রুতগামী কোন মোটরের হর্ণের শব্দ নিস্তব্ধতার বক্ষ চীরিয়া কোথায় গিয়া মিশিয়া যাইতেছে। অমূল্য একটী সরকারী পার্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি বেঞ্চের উপর উপবেশন করিল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার মনে হইল, যেন চতুর্দ্দিকের ঘরবাড়ীগুলা ঠেলিয়া আসিয়া তাহার শ্বাসরুদ্ধ করিয়া দিতেছে। সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহাকে যাইতেই হইবে। যেমন করিয়াই হউক্, যেখানেই হউক্, তাহাকে যাইতেই হইবে। পার্কের বাহির হইয়া সে পুনরায় চলিতে লাগিল।

পথে একজন কনষ্টেবল্ তাহাকে দেখিয়া সন্দিগ্ধস্বরে কহিল—এ বাবু, কাঁহাসে আতা হ্যায় ?

অমূল্য বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বলিল তাহা বুঝা গেল না।

কনষ্টেবল কহিল—আরে বাবু, মাতোয়ালা হো গিয়া। ঘর যাও।

অমূল্য মস্তক আন্দোলন দ্বারা সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিল। ধর্ম্মতলার নিকট একজন ফিটন চালক তাহাকে পাকড়াও করিল। গভীর নিশীথে কলিকাতার রাজপথে মালাগলায় একজন সুসজ্জিত যুবককে অসংযত পাদক্ষেপে চলিতে দেখিয়া ফিটনচালক তাহাকে সদ্য কোনও বারবনিতার গৃহ হইতে প্রত্যাগত অনুমান করিয়া একটু অতিরিক্ত খাতিরের সহিত অমূল্যকে গাড়ীতে উঠাইবার চেষ্টা করিল; এবং সঙ্গে সঙ্গে সবিস্তারে ইহাও বুঝাইয়া দিল যে, দেশওয়ালী গণিকাগণ কুচ্ কাম্‌কা নেহি। উহারা শুধু ফাঁকি দিয়া পয়সা লুটিতেই শিখিয়াছে, ভদ্রব্যক্তির খাতির জানে না। অমূল্য যদি বিশ্বাস করিয়া তাহার ফিটনে ওঠে তাহাহইলে সে তাহাকে এমন একজন খাঁটী পরদেশীয়ার কাছে লইয়া যাইবে যে, সে একদম্ খুস্ হইয়া গিয়া তাহাকে একযোগে দশটাকা বখ্‌শিশ্ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।

অমূল্য কিন্তু তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া যেরূপ চলিতেছিল সেইরূপই চলিতে লাগিল। মুসলমান কোচ্‌ম্যানটী সহজে তাহাকে হাতছাড়া না করিয়া কিছুদূর পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে আপন বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করিতে করিতে অগ্রসর হইল এবং অবশেষে নিরাশ্বাস হইয়া রণে ভঙ্গ দিল।

অমূল্য আর পারিল না; গড়েরমাঠের নির্জ্জন ভূমিশয্যার উপর হাত পা ছড়াইয়া, চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। নক্ষত্রখচিত উন্মুক্ত

আকাশের প্রতি চাহিয়া প্রথমেই তাহার নরেন্দ্রবাবুর কথা স্মরণ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন সমস্ত কর্ত্তব্যবুদ্ধি লইয়া সজাগ হইয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহে ফিরিতে চাহিল; কিন্তু নিষ্পন্দ দেহ তাহার কথায় আদৌ সায় দিল না। যেমন নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়াছিল, তেমনই রহিল। তাহা দেখিয়া অমূল্যর মনও যেন হাত পা গুটাইয়া বসিল। নিঃসঙ্গ, মৌন প্রকৃতির বিপুল বিস্ময়ের সম্মুখে অমূল্য তাহার পঙ্গু দেহ মন লইয়া অচেতন জড় পদার্থবৎ পড়িয়া রহিল।

দীর্ঘকালব্যাপী মহাযুদ্ধের শেষে অবসাদ যেন আজ শান্তির রূপ ধারণ করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অমূল্য একটা কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে চাহিতেছিল; কিন্তু পারিতেছিল না। আচম্বিতে তাহার জীবনে এই যে এক মহাপ্রলয় ঘটিয়া গেল, তাহার জন্য কে দায়ী? কাহার বিরুদ্ধে সে অভিযোগ আনয়ন করিবে? কাহার দ্বারে সে আজ বিচারের প্রার্থনা করিবে?

অমূল্য দেখিল, আজ আর তাহার বলিবার কিছুই নাই, ভাবিবার কিছুই নাই, করিবার কিছুই নাই!

নিজের দীর্ঘনিঃশ্বাসে নিজেই চমকিত হইয়া সে উঠিয়া বসিল। না, তন্দ্রা আসিলে চলিবেনা; একটা কিছু স্থির করিতেই হইবে; ইহার মীমাংসা চাইই চাই।

অমূল্য গলার বোতামগুলি খুলিতে গিয়া সবিস্ময়ে দেখিল, তখনও তাহার কণ্ঠে ফুলেরমালা দুঃস্বপ্নের স্মৃতি লইয়া সর্পবৎ দুলিতেছে। সে তৎক্ষণাৎ তাহা ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। পরে অন্যমনে ক্রোড়ের নিকটে ঝরিয়াপড়া ফুলগুলি এক একটী করিয়া আপনহস্তে তুলিয়া লইয়া সে একমনে তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে

চক্ষের দৃষ্টি তাহার অস্পষ্ট হইয়া আসিল। উদ্গত অশ্রু আর নিবারণ করিতে না পারিয়া পুনরায় সে শুইয়া পড়িল।

বহুক্ষণপরে সে যখন চক্ষু মেলিয়া চাহিল তখন উষার অরুণালোকে পূর্ব্বাকাশ রক্তিমাভ হইয়া উঠিয়াছে। দূর হইতে যানবাহন-চলাচলের শব্দ ঈষৎ ঈষৎ শ্রুত হইতেছে। বৃক্ষশাখা হইতে মধ্যে মধ্যে এক একটা বায়স ডাকিয়া উঠিতেছে। অমূল্য গাত্রোত্থান করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ তাহার ব্যথায় ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ অসাড়ভাবে থাকিয়া অবশেষে সে জোর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে চলিতে চলিতে নিজের অজ্ঞাতসারেই সে যখন তাহার সহপাঠী সুধীরের মেসের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার চমক্ ভাঙ্গিল; এবং পূর্ব্বাপর চিন্তা না করিয়াই সে সুধীরের কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল।

৩৪

সুধীর বসিয়া লিখিতেছিল। সম্মুখে একখানা জারুলকাষ্ঠের টেবিলের উপর অনেকগুলি কাগজপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে রহিয়াছে। তাহাদেরই একপার্শ্বে কতকগুলি খবরের কাগজের 'কাটিং'। দেখিলেই বোধ হয়, কর্ত্তিত অংশগুলি এতক্ষণ তাহার রচনার বিশেষ সাহায্য করিতেছিল। সদ্যনিঃশেষিত চায়ের পেয়ালা, স্তূপীকৃত পুস্তক ও রাশিকৃত কাগজের হুড়াহুড়ির মধ্যে অতিকষ্টে আপনার একটু স্থান সংকুলান করিয়া লইয়াছে।

অমূল্য আসিয়া সুধীরের চেয়ারের পার্শ্বস্থিত তক্তাপোষের উপর অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল। তাহার মাথার চুলগুলি অযত্ন বিন্যস্ত; চক্ষের কোণে কালিমা; পদদ্বয় ধূলামলিন; জামার বোতাম দুইএকটী আপনস্থান বিচ্যুত হইয়া বক্ষের উপর ঝুলিতেছে। এই একরাত্রে তাহার বয়স যেন দশবৎসর অতিরিক্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

সুধীর বিস্মিত হইয়া কহিল—একি ! অমূল্য ?

অমূল্যর ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ স্পন্দিত হইল; কোনও বাক্যনিঃসরণ হইল না। সুধীর লেখনী ত্যাগ করিয়া ঘুরিয়া বসিল ; কিন্তু অমূল্যর অবস্থা দেখিয়া সেও আর কিছু বলিতে পারিল না।

গতকল্য সে যাহার বাটীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়াছে, সেই কিনা আজ ফুলসজ্জার রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত—আর এই বেশে !

অমূল্য ডাকিল—সুধীর !

সুধীর কহিল—কি অমূল্য ?

আবেগশূন্য স্বরে অমূল্য কহিল—আমার কি হয়েছে জান ?

মস্তক আন্দোলন দ্বারা সুধীর তাহার অজ্ঞতা জানাইল।

অমূল্য বিকৃতকণ্ঠে কহিল—আমি এক কুলটাকে বিয়ে করেছি।

সুধীর চেয়ার ত্যাগ করিয়া লাফাইয়া উঠিল—অমূল্য !

অমূল্য চুপ্ করিয়া রহিল।

সুধীর বিদ্রোহের স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল—কে তোমাকে এত বড় মিথ্যা কথা বলেছে অমূল্য ?

অমূল্য হাসিবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু চক্ষে তাহার অশ্রু আসিয়া পড়িল। কহিল—ইন্দু বলেছে।

ইন্দু বলেছে !

সুধীর চেয়ারে বসিয়া পড়িল। ইন্দু বলিয়াছে ? ইন্দু বলিয়াছে, সে কুলটা ? ইহাও কি সম্ভব ? অমূল্যর মুখে একাধিকবার সুধীর, শঙ্কর মুখুর্জ্জের কন্যা ইন্দুর কথা শুনিয়াছে ? সেই ইন্দু বলিয়াছে, সে অসতী ?

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল—কি বলেছে ইন্দু ?

অমূল্য কহিল—মুসলমান গুণ্ডারা তা'কে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

শুনিয়া সুধীরের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পরে উঠিয়া উন্মুক্ত জানালার সম্মুখে গিয়া অমূল্যর দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কক্ষের গম্ভীর নীরবতা অজস্র জটীল প্রশ্নে উভয়কে বিহ্বল করিয়া তুলিল। অনর্গল অজস্র বাক্যাবলী সময়ে সময়ে যে ভাবশূন্য, প্রশ্নশূন্য নীরবতা সৃষ্টি করে তাহা বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু নিস্তব্ধতা যখন মুখর হইয়া উঠে তখন তাহা উপেক্ষা করা একরূপ অসম্ভব।

সুধীর ফিরিয়া আসিয়া আপনস্থান গ্রহণ করিল; পরে গম্ভীরস্বরে কহিল—একটা কথা ভেবে দেখেছ?

অমূল্য বলিল—কি?

—ইন্দু আজও আত্মহত্যা করেনি কেন?

অমূল্য ঠিক বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সুধীর বলিল—একটা কিছু বিশেষ অন্তরায় ঘটেছে বলেই মনে হয়। ইন্দুর মত মেয়ে বলেই ঐ কথাটাই ভাব্‌ছি। নয়তো আত্মহত্যা করাটা যে কত সোজা তা' তো আমার জানা আছে? তা' যাক্। এখন তুমি কি কর্‌বে স্থির করেছ?

—কৈ, স্থির তো এখনও কিছু করিনি?

—কেন করনি?

—ভেবে যে কিছু কুলকিনারা পাচ্ছি না ভাই?

সুধীর বলিল—অতর্কিত, অপ্রত্যাশিত আঘাতে মানুষের প্রথমটা তাই হয় বটে। এত বড় একটা স্বার্থে আঘাত! সাম্‌লে নেওয়া কি কম কথা?

অমূল্যর এই নিরুপায় অবস্থার সুযোগ লইয়া সহানুভূতির পরিবর্ত্তে সুধীরের কথার মধ্যে পরিহাসের ইঙ্গিতই যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। অমূল্য বিরক্তির স্বরে বলিল—এর মধ্যে স্বার্থটা আবার কোথায় পেলে সুধীর ?

সুধীর তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল—এও আবার বলে দিতে হ'বে অমূল্য ? আমরা নাই বলি, লোকে তো বলবে, আমরা লেখাপড়া শিখেছি ? এই দেখ দেখি—

বলিয়া টেবিলের উপরিস্থিত খবরের কাগজের কতকগুলি টুক্‌রা অমূল্যর হস্তে দিয়া সে বলিতে লাগিল—এর জন্য কে দায়ী অমূল্য ? হিসেব করে দেখলুম, এই বৎসরের মধ্যে এক রংপুরে যতগুলি বালিকাহরণ হয়ে গেছে তা' এক নিঃশ্বেসে বলে শেষ করা যায় না। তা'রপর পাবনার নারীহরণ আছে, ঢাকার অত্যাচার আছে, মৈমনসিংহের অপহরণ কাহিনী আছে, চট্টগ্রামের ধর্ষণবৃত্তান্ত আছে, ডায়মণ্ডহারবারের সতীত্বনাশ আছে, যশোরের মর্ম্মন্তুদ ঘটনা আছে ; কত বলব ? এসবের জন্য দায়ী কে ? আমরা। হাজার হাজার বছর ধরে নিজেদের সুখ, সুবিধা, স্বার্থের জন্যে আমরা যে ভীষণ পাপ করে এসেছি, তা'র প্রায়শ্চিত্ত আজ চতুর্দ্দিক্ দিয়ে সুরু হয়েছে ; ঠেকাবে কি দিয়ে ? আজ যদি কোন সভ্যজাতির কাছে আমাদের এই গৌরবের কীর্ত্তি নিয়ে গিয়ে দাঁড়াও, তা'হলে তা'রা আমাদের এই নারী-হরণের ফিরিস্তি দেখে শুধু বল্‌বে যে, এখনও আমরা সভ্যজগতের মুখে কালিমা লেপন করবার জন্যে পৃথিবীর পৃষ্ঠে জীবিত আছি কেন ? একটা জীবন্ত মানুষের জাতকে জড় পদার্থের মত বাক্‌সবন্দি, পেঁট্‌রাজাত্ করে রেখে রেখে আজ তা'দের বুদ্ধিবৃত্তি, আত্মমর্য্যাদা, এমনকি জীবিত মনুষ্যের সকল বিশেষণগুলিই লুপ্ত করে দিয়েছি। এখন যদি তাদের

একটু সচেতন করতে যাও তো তা'রাই চম্‌কে উঠে তোমাকে আক্রমণ কর্‌তে আস্‌বে, তোমার মাথায় অভিশাপ বর্ষণ করবে, তোমার উচ্ছেদ কামনা করবে। এখন এমন হয়েছে যে, তা'দেব সঙ্গে আমরাও আর বিপরীতটা ভাবতে পারি না। কি করে পার্‌ব ? বহুকাল চেষ্টা করে তা'দের যখন আমরা পায়ের তলায় পিষে মার্‌লুম্‌, তখন সেই নিষ্পেষণটাকেই তা'রা বাধ্য হয়ে নিজেদের স্বভাবের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে আমাদের স্পর্দ্ধাটাকে একেবারে সীমা অতিক্রম করিয়ে দিলে। সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা, দময়ন্তীর মত গোটাকতক মেয়ে জন্মে আমাদের বসিয়ে দিলে, দেবতার সিংহাসনে ; আর আমরাও আমাদের কৃতকর্ম্মের সফলতায় আত্মহারা হয়ে নির্ব্বিবাদে দিলুম্‌ পা'দুখানা এগিয়ে, তা'দের পূজো করবার জন্যে। অমূল্য, সেই সম্পত্তি আজ অপরের ভোগদখলে আস্‌ছে দেখ্‌লে কি তা' সহ্য হয় ?

অমূল্য বলিল—তুমি শুধু আমাদের দোষের কথাগুলোই বলে গেলে।

সুধীর বলিল—কি করব ? আমাদের দোষের কথাগুলোই এত জমা হয়ে উঠেছে যে সেগুলো বলতে আরম্ভ করলে আর একটাও গুণের কথা বলবার অবসর পাই না যে ? আজ যদি তুমি ঐ ইন্দুকে গিয়ে বল যে, তোমার কোন দোষ হয় নি, তুমি নিষ্পাপ, তা'হলে সে তা' বিশ্বাসই কর্‌তে পারবে না। আর সেই বিশ্বাসের অভাবই আজ তা'কে পাপী করে তুল্‌ছে। আবার যারা তাদের ঐ বিশ্বাসের অভাবের জন্য প্রকৃত দায়ী তারাও এমন বিকৃতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছে যে, ঐ পাপটা যে প্রকৃত পাপ নয়, এটুকু ভাব্‌বার সাহসও আজ তারা সম্পূর্ণ হারিয়ে বসে আছে ; কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে তো এতটুকু ফাঁক্‌ নেই। তা'র প্রতিশোধের হাত থেকে আজ কি করে উদ্ধার পাবে অমূল্য ?

সুধীরের কথাগুলির মধ্যে যে সাহস ও সহৃদয়তার সুর বাজিয়া

উঠিতেছিল তাহাতে অমূল্যর জড়তা যেন অনেকখানি দূর হইয়া গেল। ইন্দুকে তাহার পূর্ব্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে সেও যেন বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সুধীরের কথায় সে সম্পূর্ণ সায়ও দিতে পারিল না।

সে কহিল—আমাদের অপরাধটা স্বীকার করে নিলেও তোমার শেষের কথাগুলার সারবত্তা তো বুঝ্তে পারা যায় না সুধীর? আমি এই মেস্ ত্যাগ করার পর থেকে তোমার পাপপুণ্যের ধারণা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তা' অবশ্য জানি না। কিন্তু তা' দিয়েও কি তুমি সত্যই মুক্তকণ্ঠে বল্তে পার যে ইন্দু নিষ্পাপ?

সুধীর বলিয়া উঠিল—নিশ্চয়ই। কেন নয়, তাই শুনি? তুমি কিম্বা তোমার সমাজের সুবিধার মাপকাঠিতে সে আজ দাঁড়াতে পার্‌ল না বলেই কি তা'কে পাপী সাব্যস্ত করতে হবে নাকি? আর পাপপুণ্যের কথাই যদি তোল তা'হলে জিজ্ঞাসা করি, ইন্দুর পাপপুণ্য বিচার করবার তুমি কে?

অমূল্য উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—আমি তার স্বামী। অগ্নিসাক্ষী করে, মন্ত্রপাঠ করে, আমি তার সমস্ত দায়ীত্ব গ্রহণ করেছি।

সুধীর কহিল—ব্যস্। তবে আর এত ভাবনা বা আক্ষেপ কেন?

—গুরুতর কারণ ঘটেছে বলে?

সুধীর সহাস্যে কহিল—এখনও তোমার মস্তিষ্ক স্থির হয়নি দেখ্ছি। দেখ, অমূল্য, আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, 'দায়ীত্ব' কথাটা ব্যবহার করা তোমার ঠিক হয়নি। দায়ীত্ব তুমি আদৌ গ্রহণ করনি। তা' যদি সত্যি করতে তা'হলে আজ এইভাবে আমার কাছে তোমায় ছুটে আস্তে হ'ত না। শুধু গোটাকতক সংস্কৃত কথা আবৃত্তি কর্‌লেই দায়ীত্ব গ্রহণ করা হয় না। ওটা একটা এত বড় জিনিষ যে, এই পৃথিবীতে কোন মানুষই কোন মানুষের জন্য তা' গ্রহণ কর্‌তে পারে না। তুমি যেটাকে দায়ীত্ব

বল্‌ছ সেটা শুধু দেহের; আর তা'ও তোমার নিজের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুরই জন্য; তার বেশী নয়।

অমূল্য বলিল—তাই যদি হ'বে তাহলে ইন্দু বল্‌লে কেন যে, তার মনেও ছোঁয়াচ্‌ লেগেছে?

—বল্‌বে না কেন? তার দেহটাই যখন তোমাদের কাছে একমাত্র সত্য হয়ে উঠ্‌ল তখন আসল ইন্দুও যে ঐ দেহটাকেই আশ্রয় করে দাঁড়াল, আর মনটা যে চল্‌ল তা'র পিছু পিছু মাথা হেঁট করে?

—দেহটা কি কিছু নয় সুধীর? মনের আড়ালে দেহটাকে কি একেবারে লুকিয়ে ফেলা সম্ভব?

গম্ভীরভাবে সুধীর বলিল—না, তা যায় না।

সাগ্রহে অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল—তবে?

সুধীর কহিল—সেইতো হয়েছে সমস্যা? ঐ দুটো কোনখানে এসে যে সত্যকার হাত ধরাধরি করে দাঁড়ায় সেইটাইতো আজপর্য্যন্ত কেউই স্থির কর্‌তে পার্‌লে না অমূল্য? এক এক সময়, এক এক দল মানুষ ঐ দুটোর একটাকে নিয়ে এমন গোঁভরে দৌড় দিয়েছে যে, আর একটা তা'দের কাছে সম্পূর্ণ মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। আমি তো সেইজন্যেই বলছি যে নিজের সঙ্গেই যখন নিজে আজপর্য্যন্ত আফোস্‌ কর্‌তে পার্‌লে না তখন অপরের সমস্ত দায়ীত্ব মাথায় করে নেবার প্রতিজ্ঞাই বা কর কোথেকে, আর তাই নিয়ে দখ্‌লিস্বত্ব জারী কর্‌তেই বা যাও কোন্‌ সাহসে?

অমূল্য হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল—আচ্ছা সুধীর, ভালবাসাটাও কি মিথ্যা?

সুধীর সহসা অমূল্যর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল না; কিন্তু বলিল—

হাঁ। নিশ্চয়ই। যদি তা' ভালবাসার পাত্রের জন্মগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে।

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল—মানুষকে ছেড়ে মানুষের স্বাধীনতা কতটুকু?

সুধীর বলিল—যতখানি তা'কে ছেড়ে চলা যায়।

'যায়' শব্দটির উপর সুধীর বিশেষ করিয়া জোর দিল।

অমূল্য তথাপি পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ব্যবহারিক জগতে সে আর কতটুকু সুধীর ?

সুধীর বলিল—তোমার ব্যবহারিক জগৎ মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতার কতখানি মর্য্যাদা রক্ষা করে? যেখানে নিছক্ স্বার্থের জন্য মানুষ,মানুষের বুকের রক্ত অবাধে পান কর্চ্ছে, সেখানে স্বাধীনতা কথাটা গায়ের জোরের অর্থেই ব্যবহার হয়। তা'ছাড়া তোমার ঐ ব্যবহারিক জগতের বিকিকিনির মধ্যে যদি 'ভালবাসা' কথাটাকে টেনে আনো, তাহ'লে আমার অনুরোধ, ওটার বরং একটা অন্য নামকরণ কর।

একটু থামিয়া সুধীর কি চিন্তা করিল; পরে কহিল—দেখ অমূল্য, তুমি আমার কথায় যে আপত্তিটা তুলেছ,সেটা যে অভ্রান্ত নয় তা বুঝ্তে হ'লে মানুষের যে কতখানি স্বার্থত্যাগ কর্তে হয়, কত বড় দুঃখকে মাথা পেতে নিতে হয়, নিজের সর্ব্বনাশ চক্ষে দেখেও কতখানি বুকফাটা হাসি হেসে বেড়াতে হয়, তা'তো আর বলে শেষ করা যায় না? সাধারণ দৃষ্টিতে, বাহিরের দিক থেকে তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু অনেক দিক থেকে মানুষকে দরকার বলেই যে তা'র ভিতর, বাহিরের সমস্তটুকুই পাশবিক শক্তির কাছে বিনা আপত্তিতে মাথা হেঁট করে দাঁড়াবে, সে কথা তো হ'তে পারে না? যেটুকু তুমি না দিয়ে থাকতে পারবে না, যতটুকু আবার না দিলে আর একজনের জীবন ধারণ করা একরকম

অসম্ভব হয়ে পড়্‌বে সেইটুকুতেই মানুষের আসল অধিকার। তার একচুল এদিক ওদিক হ'লেই ঐ 'অনধিকার' বলে শব্দটা এসে পড়্‌বে।

অমূল্য সুধীরের কথাগুলি উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। শুনিতে শুনিতে তাহার অন্তরের গ্লানি একটু একটু করিয়া যেন অনেকখানিই মুছিয়া যাইতে লাগিল; গতরাত্রি হইতে তাহার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে যে ভীষণ ঝড় উঠিয়াছিল তাহার বেগ যেন অনেকখানিই শান্ত হইয়া আসিল। তথাপি বাহিরে তাহার কোনও অভিব্যক্তি হইল না; বরং সে যেন ফুৎকারে সুধীরের সকল যুক্তিই উড়াইয়া দিতে চাহিল। এক্ষণে যে-অমূল্য যুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল, সে যেন পূর্ব্ব-অমূল্যর সংস্কারগঠিত ছায়ামাত্র। সেইজন্য এক্ষণে তাহার বক্তব্যের মধ্যে আর যেন পূর্ব্বের সে সজীবতা রহিল না।

সে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—দাঁতের (Dante's) এল্ ডোরেডোতে (El doredo) বসে এই কথাগুলো বলা যেতে পারে। কিন্তু আমরা তো এখন তোমার সেই কল্পনারাজ্যে বাস কর্‌ছি না সুধীর?

সুধীর বলিল—তোমার অক্ষমতাই জগতের একমাত্র তুলাদণ্ড নয়। প্রমাণ চাও, বর্ত্তমান থেকে পিছনে চেয়ে দেখ। আজ থেকে পৌরাণিক যুগে গিয়ে দাঁড়াও—দেখ্‌বে, তোমারই দেশে, তোমারই ধর্ম্মে, তোমারই সমাজে মানুষের এতখানি অধঃপতন তখনও হয়নি। আবার সেখান থেকে বৈদিকযুগে গিয়ে দাঁড়াও—দেখ্‌বে, আজ যাকে তুমি কল্পনা বলে উড়িয়ে দিচ্ছ, আমার সেই এল্ ডোরেডো (El dorado) সেখানে রূপ ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সময়টা আবার যখন ফিরে আস্‌বে তখন দেখবে আবার নূতন বেদএর সৃষ্টি হবে।

নিঃসংশয়ে মানিয়া লইতে না পারিলেও অতঃপর অমূল্য, সুধীরের কথাগুলির কোনও যুক্তিপূর্ণ সদুত্তরও খুঁজিয়া পাইল না। উভয়ে পুনরায় কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। অমূল্য অধোবদনে তাহার বাক্যগুলি মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে করিতে অন্যমনে খবরের কাগজের টুক্‌রাগুলির উপর চক্ষু বুলাইতে লাগিল। হটাৎ একটী অংশ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

সুধীর তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—কি অমূল্য ?

অমূল্য ধীরে ধীরে সেখানি তাহার হস্তে দিয়া বলিল—এই দেখ।

সে যে বিশেষ বিচলিত হইয়াছে ইহা তাহার কণ্ঠস্বরেই প্রকাশ পাইল। সুধীর সেখানি আপর হস্তে লইয়া পড়িতে গিয়া দেখিল—'দিগ্‌জপুরের বালিকাহরণ'। সম্পাদক মহাশয়, তাঁহারই পত্রিকায় কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রকাশিত দিগ্‌গজপুরের শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ইন্দুবালা নাম্নী কোনও হিন্দু বালিকার অপহরণ বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া অবশেষে জানাইয়াছেন যে, তৎসম্পর্কে উক্ত গ্রামের আলিমিঞা নামক কোনও গুণ্ডাসর্দ্দার পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সদর থানায় প্রেরিত হইয়াছে ; এবং সে যে সব জবানবন্দী দিয়াছে তাহা সবিস্তারে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। শেষের একটী ক্ষুদ্র প্যারাগ্রাফে লিখিত হইয়াছে যে, শুনা যাইতেছে নাকি অল্পদিবস পূর্ব্বে উক্ত হিন্দু বালিকাটীকে কে বা কাহারা দুর্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে। খবর কতদূর সত্য তাহা জানা যায় নাই। তবে এ বিষয়ে যথারীতি পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

খবরটী সদ্যঃপ্রকাশিত কাগজ হইতে কর্ত্তিত। সুধীর যেখানে যত অপহরণ-কাহিনী ছাপার অক্ষরে দেখিয়াছে তাহা পাঠ করিয়াই হউক বা সম্পূর্ণ পাঠ না করিয়াই হউক, কাঁচির সাহায্যে কর্ত্তিত

করিয়া টেবিলের উপর সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া আসিতেছে; এবং ঐ সকল ঘটনা লইয়া কিছুদিন যাবৎ এ বিষয়ে দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া যাইতেছে। উপস্থিত-অংশটী এযাবৎ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। করিলে আজ অমূল্যর নিকট এই বিষয় অবগত হইয়া সে অতদূর বিস্মিত হইত না।

সে অমূল্যর প্রতি চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখ লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে, ক্ষোভে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সুধীর কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই মেসের ঝিকে দিয়া দোকান হইতে কিছু খাবার ও দুই পেয়ালা চা করাইয়া লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

অমূল্য তখনও সেইভাবেই বসিয়াছিল। সুধীর নিজে একটি পেয়ালা তুলিয়া লইয়া কহিল—নাও হে, জুড়িয়ে যাচ্ছে।

অমূল্য নিদ্রোত্থিতের ন্যায় সুধীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; সুধীর চা পান করিতে করিতে ইঙ্গিতে তাহাকে অন্য পেয়ালাটী দেখাইয়া দিল।

অমূল্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—থাক্।

সুধীর বলিল—তবে থাক্।

বলিয়া আপনার পেয়ালাটীও নামাইয়া রাখিল। ইহা দেখিয়া অমূল্য তাহার জন্য আনীত পেয়ালাটী গ্রহণ করিল। উভয়েই চা' পান করিতে করিতে স্ব স্ব চিন্তায় মগ্ন হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে সুধীরই প্রথম কথা কহিল। সে বলিল—এই ঠুন্‌কো মন নিয়ে আমরা জগতের কি কাজে যে আস্‌বো তা'তো ভেবে পাই না!

অমূল্য শুনিতে লাগিল।

সুধীর বলিয়াই চলিল—দুর্গদ্বারেই যদি সমস্ত সৈন্য হত হয়ে পড়্‌ল তো দুর্গ অধিকার করি আর কা'কে নিয়ে! প্রতিনিয়ত আমরা

পরস্পরকে যেভাবে গড়ে তুলছি সেইভাবেই তো চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকৃতে পারবো না? মাঝে মাঝে ভাঙন্ তো ধরবেই। ওই যে নাকটিপে প্রাণায়াম করে সমাধির আশায় চোখ্ বুজে বাইরেটাকে মুছে ফেলবার আপ্রাণ চেষ্টা, ওর মধ্যে এক কাপুরুষতা ছাড়া আর তো কিছুই দেখ্তে পাই না? অথচ ওই ভাঙনের মুখ থেকে আত্মরক্ষাও তো করতে হবে অমূল্য? কতদিন ধরে আমরা একসঙ্গে পড়া মুখস্থ করে এসেছি, একসঙ্গে ভেবে এসেছি; একসঙ্গে তর্ক করেছি, আলোচনা করেছি। আমি জানি, আমার এইসব কথায় আজ তুমি আদৌ আশ্চর্য্য হবে না। আজ তোমাকে শুধু এইটুকু বল্‌বার আছে যে, ইন্দুকে তুমি গ্রহণও করতে পার, ত্যাগও করতে পার; তা'তে আমার কিছু অভিযোগ নেই; কিন্তু যদি দেখি তোমার থেকে ইন্দুকে নূতন করে দুঃখ পেতে হচ্ছে তাহ'লে আমি দুঃখ করব না, তোমার ওপর রাগও করব না, শুধু আশ্চর্য্য হ

অমূল্য দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—আমায় আর যাই ভাব সুধীর, কাপুরুষ আখ্যাটা যে আমাকে সহজে দেওয়া যায়, এ ভুল ধারণাটা নিশ্চয়ই তোমার কোনও দিনই হয় নি।

উল্লাসসূচক স্বরে সুধীর বলিল—এতদিনের মধ্যে বন্ধু বল্‌তে যে আর কোনও তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের ভাগ্যে জুট্‌ল না, সে বোধ হয় এই জন্যেই। আচ্ছা, এখন এস দেখি, উপস্থিত আমাদের সাহসের দৌড়টা এই ক'খানা কচুরি সিঙ্গাড়ার উপর দিয়েই হয়ে যাক্। তা'রপর স্নানাহারের পর্ব্বটা আজকের মত, না হয়, তোমাদের ওখানে গিয়েই সেরে নেওয়া যাবে।

একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অমূল্যকে আনীত খাবারের কিয়দংশ গলাধঃকরণ করিতে হইল এবং জলযোগান্তে উভয়ে নরেন্দ্রবাবুর বাটীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

যাত্রাকালে সুধীর কি ভাবিয়া সংবাদপত্রের কর্ত্তিত অংশটী সঙ্গে লইল।

৩৫

নরেন্দ্রনারায়ণ বাবুর সদাপ্রফুল্ল মুখে আজ চিন্তার রেখা গভীরভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বৈঠকখানা ঘরে তিনি তাকিয়া হেলান দিয়া অর্দ্ধশায়িতভাবে রহিয়াছেন। গড়্‌গড়ার নলটী তাঁহার হস্তে বহুক্ষণ যাবৎ অধরস্পর্শের অপেক্ষা করিতেছে; কিন্তু চিন্তার কূটজালের মধ্যে পড়িয়া তিঁনি এতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন যে ধূমপানেচ্ছা তাঁহার আদৌ আছে বলিয়াও মনে হয় না। সম্মুখে সদ্যঃ খামমুক্ত একখানি পত্র তাঁহার এই অবস্থার কারণ অনেকখানি ইঙ্গিত করিতেছে।

সুবাসিত তৈল, গামছা, তোয়ালে প্রভৃতি স্নানের দ্রব্যাদি হস্তে লইয়া ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইল। বহুক্ষণ যাবৎ তাহাকে তিঁনি দেখিয়াছেন বলিয়াই মনে হইল না।

অবশেষে সাহস সঞ্চয় করিয়া ভৃত্যটী ডাকিল—বাবু!

চমকিত হইয়া নরেন্দ্রবাবু তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

ভৃত্যটী ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—বারটা বেজে গেছে বাবু।

নরেন্দ্রবাবু অন্য মনে বলিলেন—যা, যাচ্ছি।

সে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে তিঁনি বলিলেন—আর দ্যাখ্, মাষ্টার বাবু এখনও আসেন্‌নি?

সে কহিল—এজ্ঞে না।

শুনিয়া তাঁহার ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত হইল; তিঁনি বলিলেন—আচ্ছা, এলে আমায় বলে যাস্।

ভৃত্যটী প্রস্থান করিলে পুনরায় তিঁনি তাকিয়া হেলান দিয়া নলটী মুখে তুলিলেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তাম্রকূট সেবন করা আর তাঁহার ঘটিয়া উঠিল না। বাধাপ্রাপ্ত চিন্তার শেষসূত্র অবলম্বন করিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই তিঁনি ধীরে ধীরে অন্তরের নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে ভৃত্যটী ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে মাষ্টার বাবু এবং সুধীরবাবু এইমাত্র বাটী আসিয়াছেন।

শুনিয়া সর্ব্বাগ্রে তিঁনি পত্রখানি খামের মধ্যে পুরিয়া রাখিলেন; পরে দুইজনকেই তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে বলিয়া তিঁনি সোজা হইয়া বসিলেন এবং যথেষ্ট উৎসাহের সহিত ঘন ঘন তাম্রকূটের ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে অমূল্য ও সুধীর আসিয়া উপস্থিত হইল। তিঁনি উভয়কেই বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা বসিল। মহাঅপরাধীর ন্যায় জড়সড় হইয়া অমূল্য ভূমির উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া রহিল। তাহার উন্নত মস্তক আজ যেন মাটীতে মিশিয়া যাইতে চাহিতেছে; আজ আর তাহার সেই সরলতামাখা সতেজ দৃষ্টি নাই। তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর যেখানে যত গর্হিত অপরাধ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য একমাত্র দায়ী সেই।

তাহার এই ভাব নরেন্দ্রবাবুর দৃষ্টি অতিক্রম করিল না; তথাপি তিঁনি সহজভাবেই কহিলেন—দেখ অমূল্য, আজই তোমায় কাশী রওনা হ'তে হ'বে বাপু। অতগুলো টাকা খরচ করে বাড়ীখানা তৈরী করলুম; শেষে তোমরা থাকৃতেও দেখ্‌বার শোন্‌বার লোকাভাবে যদি সেখানা ভেঙ্গেচুরে নষ্ট হয়ে যায় তো সেটা কি কম আক্ষেপের কথা? এতদিন শুধু তোমার পরীক্ষার জন্যেই যা অপেক্ষা করৃছিলুম। কনকেরও পূজোর ছুটী হয়ে গেল। এখনও যদি না এর একটা ব্যবস্থা করা যায় তো সহজে আর হয়ে উঠবে না। কি বল সুধীর?

সুধীর মস্তক আন্দোলনদ্বারা আপন অভিমত ব্যক্ত করিল।

নরেন্দ্রবাবু কহিলেন—টিকিট ক'খানা কিনতে সরকার মশাই গিয়েছেন। তোমার আর ইন্দুর যা যা দরকার বিদ্যুৎ তা'র ব্যবস্থা করে ফেলবে'খন। দুইএক মাস থাকা বইতো নয়? আমার মনে হয়, তা'র মধ্যেই বাড়ীর মেরামতি কাজ হয়ে যাবে। না হয়, হারাণ, চাই কি, শেষে আমিও গিয়ে পড়্‌তে পারি। ততক্ষণ তুমি তো গিয়ে কাজ সুরু করে দাও। এদিকে পরীক্ষার খবরের জন্য ভেব না! রোলনম্বর তো জানি? সময়মত খবর পাবেই। আর সুধীরও চেষ্টা করৃলে গেজেটের আগেই খবর দিতে পারবে। তা' নাও, আর বেলা ক'র না। তৈরী হয়ে নাও গে। অবশ্য বিশেষ ব্যস্ত হ'বার কারণ নেই। সেই সন্ধ্যের এক্সপ্রেস্। সময় অনেক আছে। হারণকেও সব বলে দিয়েছি। সেও সব ঠিক করে রাখবে'খন। সেখানে গিয়ে পৌছুলে কি কি কাজ করৃতে হবে সব চিঠিতে জানাব। নাও, ওঠ আর বিলম্ব কর না।

তাঁহার মুখ হইতে যেভাবে এতগুলা কথা একের পর আর একটী অনর্গল এবং অবিশ্রান্তভাবে বাহির হইয়া গেল তাহাতে তাহার মধ্যে

এরূপ এতটুকু ফাঁকও ছিল না, যাহাকে সন্দেহ বা প্রতিবাদ করা যায়। তাঁহার কণ্ঠস্বরে এরূপ একটী নিশ্চয়তা ছিল যাহাকে উপেক্ষা করিবার সাহস বা স্পর্দ্ধা আর যাহারই হউক অমূল্যর আদৌ ছিল না।

তাঁহার কথায় অমূল্য উঠিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে সুধীরও উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া নরেন্দ্রবাবু কহিলেন—উঁহুঁ, সুধীর, তুমিও যেন যেও না?

অগত্যা সে পুনরায় আসন গ্রহণ করিল। অমূল্য প্রস্থান করিল। নরেন্দ্রবাবু ঘন ঘন ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন।

সুধীর কিছুক্ষণ মৌনভাবে বসিয়া রহিল। অবশেষে নরেন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন—দেখ সুধীর, আমি জানি সুহৃৎ বল্‌তে যা বোঝায় অমূল্যর তুমি তা'ই। তোমাকে অনেকবার দেখেছি বা জানি বলেই যে শুধু একথা বল্‌ছি তা' নয়। বাইরের দিক থেকে দেখ্‌লে, আমি কেন, যে কোনও লোকই এটা বুঝ্‌তে পারবে।

এইমাত্র যে ব্যক্তি অমূল্যর সহিত অতগুলা:কথা ঐরূপভাবে ঝড়ের ন্যায় কহিয়া গেলেন, সেই ব্যক্তিই যে পরমূহূর্ত্তে এইরূপ, যুক্তিদ্বারা সমর্থিত, সতর্ক বাক্যসকল ব্যবহার করিতে পারেন, নরেন্দ্রবাবুকে পূর্ব্ব হইতে না জানিলে ইহা দেখিয়া সুধীর অবশ্যই আশ্চর্য্যবোধ করিত। সেইজন্য এক্ষণে সে ইহা দেখিয়া গুরুতর কিছু শুনিবার আশায় প্রস্তুত হইয়া রহিল; এবং অমূল্যর বিষয়ে ইহারই মধ্যে তিঁনি কতদূর অবগত হইয়া থাকিতে পারেন তাহাও মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিল।

নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—অবশ্য শোণিতসম্বন্ধ ধর্‌তে গেলে অমূল্যর

আমি কেহই নই বটে, নয়তো ওর ভালমন্দের ওপর আমার দৃষ্টি বা স্বার্থ কম নেই, একথা নিশ্চয়ই তুমি জান।

আগ্রহের সহিত তাঁহার কথা সমর্থন করিবার নিমিত্ত সুধীর কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় নরেন্দ্রবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—তা'হলে বুঝ্‌তে পার্‌ছ তো, যে আমার কাছে অমূল্যর কোনও কথা গোপন থাকা উচিৎ নয়?

শুনিয়া সুধীর কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল। পরে কহিল—অমূল্যর বিষয় যতটুকু জান্‌তে পেরেছি তা' আপনাকে বলতে আমার কোনও বাঁধা আছে বলে মনে করি না।

সন্তুষ্ট হইয়া নরেন্দ্রবাবু কহিলেন—সবটুকু না বল্‌লেও চলবে।

বলিয়া তাঁহার সম্মুখের খামখানি সুধীরের হস্তে দিয়া বলিলেন—এর পর থেকে যতটুকু বল্‌বার আছে বল্‌তে পার।

খাম খুলিয়া সুধীর দেখিল, পত্রখানি দিগ্‌গজপুর নিবাসী তারিণী চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। সুদীর্ঘ পত্রখানির প্রথম অর্দ্ধপৃষ্ঠা জমীদার নরেন্দ্রনারায়ণ বাবুর যশোগানেই পূর্ণ। তাঁহার ন্যায় অগাধ ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী যে স্বয়ং কুবেরও হইতে পারেন নাই, তাঁহার ন্যায় দাতা যে স্বয়ং দাতাকর্ণও চক্ষে দেখেন নাই, তাঁহার ন্যায় দয়া যে এক শ্রীচৈতন্য ব্যতিরেকে আর কাহারও ছিল না, তাঁহার মত ন্যায়নিষ্ঠা যে একমাত্র সত্যযুগেই দৃষ্ট হইত, শ্রীরামচন্দ্রের পর শ্রীভগবান সমাজ ও ধর্ম্ম রক্ষাকল্পে যে এই ঘোর কলিকালে স্বর্গসুখত্যাগ করিয়া ধরাধামে পুনরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা নরেন্দ্রনারায়ণ বাবুকে দেখিয়া আর কাহারও জানিতে বাকী নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহার পর যাহা বিবৃত করা হইয়াছে তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, তাঁহার আশ্রিত হারাণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র অমূল্যধন, ইন্দু নাম্নী যে কন্যাটীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গৃহে গিয়া

উঠিয়াছে তাহাকে কিছুদিন পূর্ব্বে মুসলমান গুণ্ডাগণ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল; এমন কি এক্ষণে বিশেষভাবে জানা গিয়াছে যে, ঐ ইন্দুবালা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেই অমূল্যধনের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। এমত অবস্থায় নেহাইৎ কর্ত্তব্যবোধেই তিনি নিবেদন করিতে বাধ্য হইতেছেন যে, যে-কন্যার গর্ভে ম্লেচ্ছের ঔরষজাত সন্তান বিদ্যমান্ এবং যে ব্যক্তি তাহাকে বধূ বা পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়া জমিদারবাবুর গৃহে তুলিয়া তাঁহার জাতি ধর্ম্ম খাইতে বসিয়াছে, তাহাদের অবিলম্বে পরিত্যাগ না করিলে নরেন্দ্রনারায়ণ বাবুর ধর্ম্মহানি এবং হিন্দুসমাজের সমূহ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা।

সুধীর পত্রখানি নরেন্দ্রবাবুকে প্রত্যর্পণ করিল। নরেন্দ্র বাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

সুধীর কহিল—গতরাত্রে এই ঘটনা জান্‌তে পেরে অমূল্য সারারাত কল্‌কাতার পথে পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছে। আজ সকালে সে আমার কাছে গিয়েছিল; সেখানে আমরা দুজনেই এইটিও দেখ্‌তে পেয়েছি।

বলিয়া মেস হইতে আনীত খবরের কাগজের পূর্ব্বদৃষ্ট টুক্‌রাটী নরেন্দ্রবাবুর হস্তে দিল। নরেন্দ্রবাবু সেখানি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন; পরে সেখানি সুধীরকে প্রত্যর্পণ করিয়া সনিঃশ্বাসে অনেকখানি আপনমনেই কহিলেন—এতক্ষণে ব্যাপারটার আদ্যোপান্ত বোঝা গেল।

সুধীর তাঁহার প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সে যাহা জানিয়াছে তাহা ব্যতিরেকে আদ্যোপান্ত ব্যাপারটি আর যে কি হইতে পারে তাহা সে সম্যক্ বুঝিতে পারিল না।

নরেন্দ্রবাবু তাহা লক্ষ্য না করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা,

তারিণীর চিঠিতে যা যা লেখা আছে অমূল্য কি সে সবই জানতে পেরেছে?

তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া সুধীর মাথা নত করিয়া কহিল—না। তবে আমি অনেকটা সন্দেহ করেছিলুম।

ভারিগলায় একটা 'হুঁ' বলিয়া নরেন্দ্রবাবু তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সজোরে মুখের নল্‌টা মেঝেয় নিক্ষেপ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—উঃ, মানুষ এতদূর শয়তানও হতে পারে!

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি এই ঘটনার মূলে আর কা'কেও সন্দেহ কর্চ্ছেন?

নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—সন্দেহ কি হে? এ যে চাক্ষুষ দেখ্‌তে পাচ্ছি? নয়তো আমার ঐ কাশীর বাড়ীটা এতদিন দাঁড়িয়ে থাকৃতে পার্‌লো, আর আজদিনটা অপেক্ষা কর্‌লেই কি সেটা সত্যি সত্যিই হুড়্‌মুড়্‌ করে পাঁচজনের ঘাড়ের ওপর পড়ে যেত? তা নয়, আসল কথা হচ্ছে এই সমস্যার মীমাংসা অমূল্যকে একলাই কর্‌তে হবে। আমরা কি পারি জান? ঐ তারিণীটাকে কোন উপায়ে জব্দ করতে, আর কিছু না।

সুধীর কি বলিতে যাইতেছিল নরেন্দ্রবাবু তাহাকে বাঁধা দিয়া বলিলেন—অমূল্যর সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে নিশ্চয়ই তোমার আলোচনা হয়েছে। কিন্তু একটা কথার মীমাংসা কি তোমরা করেছ?

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল—কি?

নরেন্দ্রবাবু বলিলেন—এই ধর, বিবাহের পূর্ব্বে না হয়ে পরে যদি ঐ অমূল্যর শয্যা থেকে ইন্দুকে; ঐ সব দুর্বৃত্তেরা ছিনিয়ে নিয়ে যেত, তা'হলে আজ সে কি করত?

প্রশ্ন শুনিয়া সুধীর সোজা হইয়া বসিল। অমূল্য এই বাটীতে আসা

হইতে নরেন্দ্র বাবুর সহিত তাহার যে অল্পবিস্তর আলাপ হইয়াছে তাহা হইতে সে তাঁহাকে একজন উচ্চহৃদয়, স্নেহপরায়ণ, অমায়িক ধনীর পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। তিঁনি যে একজন বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তি ইহাও তাহার অবিদিত ছিল না। কিন্তু আজ তাঁহার এই প্রশ্নে সে বিস্ময় অনুভব করিল। খনার-বচন অনুসারে হাঁচি টিক্‌টিকির বাঁধা মানিয়া না চলিলেও, আবশ্যক উপস্থিত হইলে তিঁনি যে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের শিখা কর্ত্তন করিতেও প্রস্তুত, ইহা সে কদাপি অনুমানও করে নাই। সেইজন্য সে এই প্রশ্নের উত্তর করিয়া উপস্থিত আলোচনায় আপনার স্বাধীনতা কতদূর তাহাই জানিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

সে কহিল—না। একথা আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিনি। তবে শাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থায় সে রাজী কি না, সেকথা আমি কি করে বল্‌ব বলুন?

নরেন্দ্র বাবুর মুখে হাস্যের রেখা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

তিঁনি বলিলেন—হাঁ। শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের কথাই আছে বটে। কিন্তু কর্‌বে কে? দেখ সুধীর, তোমার শাস্ত্রের কথাই যদি ধরি, তা'হলে কুমারী কন্যার ভালমন্দর জন্যে বাপ মা দায়ী, বিবাহিতা নারীর জন্যে স্বামী দায়ী, এমন কি, বৃদ্ধার জন্যে উপযুক্ত সন্তানও নাকি দায়ী। বেশ। বোঝার কথাই যদি হ'ল বাবা, তা'হলে এটাও তো ভাবতে হবে যে, বেশী ভার বলে মুটে যদি মাথা থেকে বোঝাটাকে মাটিতে ফেলে দেয় তা'হলে দণ্ড দেবে কে? মুটে না মোট? তোমার মত শিক্ষিত ছেলেরা জবাব দেবে, মুটেই দণ্ডনীয়। বেশ কথা। সে না হয় দণ্ডই দিলে। তারপর? বোঝা কি আর মাথায় উঠ্‌বে?

সুধীর কহিল—তা না উঠুক্। দণ্ড দিয়ে চক্ষু তো খুল্‌বে?

নরেন্দ্র বাবু বলিলেন—কিন্তু তা'তে তো শক্তি বৃদ্ধি হ'বে না বাবা? বোঝা যে পথের ধুলোতেই পড়ে থাকবে?

বলিতে বলিতে নরেন্দ্র বাবুর দৃষ্টি এবার যেন কোন্ সুদূর, অজানা ভবিষ্যতের অভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

তিঁনি বলিলেন—হয়তো কথাটা আমার খুব বিজ্ঞানসম্মত হ'ল না, হয়তো সেটা কালক্রমে শক্তি বৃদ্ধিরই কারণ হয়ে উঠবে, কিন্তু সে দণ্ড মাথা পেতে নেবার লোকও তো আজ দেখতে পাইনে বাবা?

সুধীর কহিল—আজ না পান্, দু'দিন পরে হয়তো পেতে পারেন।

নরেন্দ্র বাবু কহিলেন—ঠিক কথা। এতে আর 'হয়তো' নেই, পাবোই। সে দিনের আর বেশী দেরীও নেই। দেখ সুধীর, মিথ্যেকে নিয়ে খেলা করা, আগুন নিয়ে খেলা করারই সমান। একথা যেদিন মানুষ বুঝবে সেদিন যে সে আর দাহের ভয়ে পিছু হটবে না এ আমি জানি। কিন্তু চোখের জল বাঁধা মানবে কেন? যাকে বোঝা বলেছি দুটো সংস্কৃত অক্ষরে লেখা আছে বলেই সে তো আর সত্যি সত্যিই বোঝা নয় বাবা? সে যে মানুষের জীবনের একমাত্র সম্বল। তাকে পিছনে রেখে মানুষ কোন্ সাহসে সামনে এগিয়ে চলবে?

এই মানুষটীর ভিতর এতখানি হৃদয় ছিল, ইহার চক্ষে এতখানি দূরদৃষ্টি ছিল, ইহার জ্ঞানের এরূপ গভীরতা ছিল, সুধীর পূর্ব্বে তাহা কল্পনাও করে নাই। সে উত্তর দিবে কি? শ্রদ্ধায় তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল। সে শুধু মুগ্ধদৃষ্টিতে নরেন্দ্র বাবুর পানে চাহিয়া রহিল।

নরেন্দ্র বাবু বলিয়াই চলিলেন—এমন অমূল্য, এমন শঙ্কর, এমন হারাণ, তুমি অনেক পাবে, যা'রা এখনই হয়তো ইন্দুর জন্যে নিজেরাই ঘটা করে প্রায়শ্চিত্ত করতে ব্যস্ত হবে; কিন্তু ইন্দুর চোখের

জল তা'তে একফোঁটাও কম্‌বে না। ইন্দুর কল্যান তা'তে এতটুকুও হ'বে না। অন্তরের দেবতাকে অপমানের আসন থেকে উদ্ধার করে আনবার জন্তে পশ্চিমে খুব শাঁখ ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো। বড় আশা করে তা'দের দিকে চোখ ফেরালুম। কিন্তু দেখলুম, সেখানেও ফাঁকীর সঙ্গে ফাঁকীর লড়াই! সেখানেও গরল ঘেঁটে গরলই উঠ্‌ছে, এক বিন্দু অমৃতের সন্ধান নেই! বাইরে থেকে সমাজের গায়ে খুব খানিকটা অস্ত্রোপচার করেও লাভ হবে না বাবা। আমরা চেষ্টা করে সব অনিষ্টের মূল ঐ তারিণীটাকে যে একেবারেই শাস্তি দিতে পারি না, তা নয়। কিন্তু ক'টা তারিণীকে আমরা জব্দ কর্‌ব? ঐ যে দিগ্‌গজপুরের একটা তারিণী দেখ্‌ছ, ও কে জান? ও আমাদেরই দুর্ব্বলতার, হীনতার, অজ্ঞতার, মূর্ত্ত প্রকাশ। আমাদের যত দোষ, যত ত্রুটী, গোপন করে ঐ একটা তারিণীকে শাস্তি দিলে, সে শাস্তি ঘুরে আমাদেরই মাথায় এসে পড়বে; ইন্দুর তা'তে এতটুকুও মঙ্গল হবে না। এখন উপায় কি, বল দেখি বাবা?

সুধীর আর বলিবে কি? সে দেখিল, নরেন্দ্র বাবু এতক্ষণ যাহা বলিয়া গেলেন সে সকলই তাহার কথারই প্রতিধ্বনি।

সে শুধু কহিল—হয়তো একেবারে নিরাশ হ'বার কারণ না ও থাকতে পারে নরেন্দ্র বাবু। দেখুন্ না কেন, যে-বিষয় নিয়ে আজ আমি বা আপনি আলোচনা কর্‌ছি, কিছুদিন আগে কেউ এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেও তো সাহস কর্‌তো না?

নরেন্দ্রবাবু কহিলেন—না, নিরাশ হইনি। জগৎ যখন ক্রমবিবর্ত্তনশীল তখন সুদিন আস্‌বেই। আজ আমাদের সমবেত দুর্ব্বলতা, হীনতা, অজ্ঞতা দিয়ে যে তারিণীকে গড়ে তুলেছি সেই তারিণীকে ধ্বংশ করবার জন্তে কাল আবার আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবেই। ব্যষ্টিগত

ইচ্ছাশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে দেবতারা যখন দশপ্রহরণধারিণী দুর্গার আবাহনস্তোত্র গান করেছিলেন তখন দেবীর অসুরনাশিনী রূপ ধারণ করে আবির্ভূতা হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। দেবতাদের অক্ষমতার ফাঁকে যে-দৈত্য জন্মলাভ করেছিল তাঁদের শক্তির উদ্বোধনেই তার মৃত্যু অনিবার্য্য। এ কথা তো ভুলিনি বাবা?

সুধীর কহিল—তবে?

নরেন্দ্র বাবু কহিলেন—যখন ভাবি যে, কত প্রাণ বলি দিয়ে তবে সেই কল্যানকে ডেকে আন্‌তে হবে তখনই ভয়ে বুকটা আমার কেঁপে ওঠে।

সুধীর কহিল—তবে অমূল্যকে আর ইন্দুর সঙ্গে কাশীতে পাঠাচ্ছেন কেন?

নরেন্দ্র বাবু কহিলেন—ঐটুকুই আমাদের হাতে আছে বলে। আর ওটুকু আমাদের করাও চাই। চুপ্‌ করে বসে থাক্‌লে তো চলবে না বাবা? এতে হয়তো উপস্থিত কোন সুফল ফলবে না, এতে হয়তো অনেকের দুঃখের কারণও ঘট্‌বে। কিন্তু পরমেশ্বরের যদি কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তো সে এই পথ দিয়েই হ'বে।

সুধীর কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় হারাণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—দাদা!

নরেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার প্রতি চাহিলেন।

হারাণ কহিলেন—পুলিশের লোক।

সুধীর চমকিত হইল। নরেন্দ্র বাবু কহিলেন—কি চায়?

হারাণ কহিলেন—আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

নরেন্দ্র বাবু কহিলেন—বটে! তা আস্‌তে বল।

হারাণ প্রস্থান করিলেন ও অবিলম্বে ধুতি ও পাঞ্জাবী পরিহিত

একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া পুনঃপ্রবেশ করিল। তাহার পার্শ্বচর কনষ্টেবলদ্বয় বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

নরেন্দ্রবাবু তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলে তিনি নরেন্দ্রবাবুকে ক্ষুদ্র একটী নমস্কার করিয়া সম্মুখের চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

নরেন্দ্র বাবুই প্রথম কথা কহিলেন। তিঁনি বলিলেন—আমার সঙ্গেই কি আপনার আবশ্যক ?

আগন্তুক ভদ্রলোকটী বলিলেন—আঁজ্ঞে হাঁ। দিগ্‌গজপুর সম্বন্ধে আপনার কাছে আমাকে আস্‌তে হয়েছে।

নরেন্দ্র বাবু বলিলেন—বটে! আপনি কি ঐখানকারই ইন্স্‌পেক্টর ?

পুলিশ ইন্স্‌পেক্টর মস্তক আন্দোলন দ্বারা উত্তর দান করিয়া হারাণ এবং সুধীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

পুলিশ ইন্স্‌পেক্টরএর উদ্দেশ্য বুঝিয়া নরেন্দ্র বাবু কহিলেন—এঁদের সামনে অসঙ্কোচে আপনি দিগ্‌গজপুরের বিষয়ে আলোচনা বা প্রশ্ন কর্‌তে পারেন।

ইহা শুনিয়া ইন্স্‌পেক্‌টর ভদ্রলোক কহিলেন—দেখুন্ নরেন্দ্র বাবু, ইন্দুবালার কেস্‌টার তদন্তের ভার আমার ওপরই পড়েছে। এখন জানা গিয়েছে যে, তারিণী চাটুজ্জের প্ররোচনায় আলিমিঞা নামে একটা গুণ্ডা তা'র দলবল নিয়ে ইন্দুবালাকে অপহরণ করেছিল। ঐ গুণ্ডাটাকে হাতকড়া পরাবার পর সে সমস্ত ব্যাপার স্বীকার করেছে। তারিণী এখন জামীনে খালাস আছে বটে, কিন্তু আদালতের কাণ্ড বুঝ্‌ছেন তো ? ইন্দুবালাকে নিয়ে টানাটানি হবেই। তাই আপনার কাছে আস্‌তে হয়েছে।

নরেন্দ্র বাবু বিচলিত কণ্ঠে কহিলেন—কিন্তু তার যে বিয়ে হয়ে গিয়েছে ইন্স্‌পেক্টর বাবু ?

ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু কহিলেন—তা হয়েছে স্বীকার করি। কিন্তু ইন্দুবালার সাহায্য না পেলেও তো দোষীর শাস্তি হয় না, নরেন্দ্র বাবু?

"তা হয় না বটে, কিন্তু—" বলিয়া তিনি ঘন ঘন তাম্রকূটসেবন করিতে লাগিলেন। পরে হারাণ ও সুধীরকে কিছুক্ষণ বহির্ব্বাটীতে বসিতে বলিয়া কিয়ৎক্ষণ যাবৎ ইন্‌স্‌পেকটর ভদ্রলোকটীর সহিত গোপনে কি পরামর্শ করিলেন। ভদ্রলোকটী অল্পক্ষণ পরে নরেন্দ্রবাবুকে প্রণাম করিয়া হাস্যমুখে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ইন্‌স্‌পেকটর মহাশয় প্রস্থান করিলে বহির্ব্বাটীতে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। কে একজন অপরিচিত ব্যক্তি গৃহকর্ত্তার বিনা অনুমতিতে দ্বারবান্‌ ও ভৃত্য সকলের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া নরেন্দ্র নারায়ণ বাবুর বৈঠকখানার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে।

গোলমাল শুনিয়া সুধীরের সহিত হারাণ, নরেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতেই তারিণী ছুটিয়া আসিয়া হারাণের হাত দুইটী ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—আমাকে বাঁচা হারাণ। হাজারই হোক্, আমি তোর মা'র পেটের ভাইরে!

নরেন্দ্র বাবু দেখিলেন, আগন্তুকের শ্যামবর্ণ খর্ব্বাকার নগ্নদেহে শুভ্র উপবীত, ললাটে চন্দনরেখা; মস্তকে সপুষ্প শিখাগুচ্ছ যেন হিন্দুসমাজকে মর্ম্মান্তিক উপহাস দ্বারা লাঞ্ছিত করিতেছে। তাঁহার স্কন্ধবিলম্বিত অর্দ্ধমলিন উত্তরীয়, হস্তের লাঠি-সমেত ছত্রদণ্ড এবং পদদ্বয়ের বহুপুরাতন কট্‌কি চটিজুতা যেন হিন্দুর শোচনীয় শিক্ষার অভাবকে পরিস্ফুট করিয়া দিতেছে।

হারাণ অনেকখানি নিরুপায়ভাবেই নরেন্দ্রবাবুর প্রতি কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তারিণীও আপন বুদ্ধির সাহায্যে তাঁহাকে

স্বয়ং জমিদার স্থির অনুমান করিয়া সহসা গিয়া তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন—ব্রাহ্মণকে জেল্ থেকে বাঁচান্!

তারিণীর কোটরগত ক্ষুদ্রচক্ষুনিঃসরিত অশ্রুর উৎস নরেন্দ্র বাবুর প্রাণে এতটুকুও সহানুভূতি সঞ্চার করিতে সমর্থ হইল না।

তিঁনি ধীরে ধীরে নিজপদদ্বয় মুক্ত করিয়া লইয়া বলিলেন—থাক্।

তাঁহার মুখের কঠোর গাম্ভীর্য্য এবং কণ্ঠস্বরের একান্ত রুক্ষভাবে তারিণী চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। তিঁনি বালকের ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—তবে আমার কি হবে?

বিরক্তির সহিত গাত্রোত্থান করিয়া নরেন্দ্র বাবু হারাণকে লক্ষ্য করিয়া তিক্তকণ্ঠে কহিলেন—হারাণ, ওঁর আহারাদির ব্যবস্থা করে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসো।

বলিয়া তিঁনি অন্দরঅভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তারিণী কিছু বুঝিতে না পারিয়া একবার হারাণ এবং একবার সুধীরের দিকে অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন।

৩৬

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর এক সুবৃহৎ অট্টালিকা। পুণ্যতোয়া পঞ্চগঙ্গার তীরস্থিত সেই অট্টালিকার ত্রিতলস্থ একটী কক্ষে আসন্ন প্রসবা ইন্দুবালা আজ কঠিন রোগশয্যায় শায়িতা। তাহার দেহের সে স্বাভাবিক কমনীয় সৌন্দর্য্য আর নাই; অঙ্গের সে লাবণ্য আজ তাহার লুপ্ত; গণ্ডের সে লালিমা আজ তাহার পাণ্ডুর; চক্ষের সে দীপ্তি আজ তাহার নিস্তেজ; মস্তকের সে কুঞ্চিত কেশপাশ আজ তাহার এলায়িত, ধূসর; রক্তশূন্য দেহের স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, দেহটাকে সে যেন আর কোনরূপেই ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না; সেটা যেন ক্রমাগতই তাহার পশ্চাতে লুটাইয়া পড়িতে চাহিতেছে; তাহার সহিত সে আর সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারিতেছে না। মনও তাহার আজ বড় ক্লান্ত; সেও যেন আর ঐ রক্ত-মাংসের বোঝাটাকে টানিয়া লইয়া যাইতে অসমর্থ।

সে আবার শুধু ক্লান্ত নয়; বহুদিনের অবিরাম সঙ্ঘর্ষে সে আজ ক্ষতবিক্ষত!

মনের এই মর্ম্মন্তুদ অবিচ্ছেদ, অবিশ্রান্ত যুদ্ধে সে জয়লাভও করিতে পারে নাই। সে বিশ্বাসও করিতে পারে নাই যে, সে নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক। সে আপনাকে বুঝাইতেও পারে নাই যে, সে দোষী।

অতীতের জ্বালাময়ী স্মৃতির উপর্য্যুপরি কঠোর আঘাতে সে আজ মরণের একান্ত শরণাপন্না; কিন্তু গর্ভস্থ সন্তানের দূরাগত সুমধুর আহ্বানে সে আজ বাঁচিতে চাহে কি না তাহাও যেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

সম্মুখস্থ গঙ্গার পূত প্রবাহের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া মধ্যে মধ্যে তাহার মনে হয়, যদি এমন হইত যে ঐ পবিত্র জলে একবার স্নান করিয়া উঠিলে শিশিরধৌত শেফালীর মত, মেঘমুক্ত চন্দ্রমার মত, তমিস্রামুক্ত সন্তঃপ্রভাতের মত আবার সে আপনার নির্ম্মল, নিষ্পাপ শৈশব ফিরিয়া পাইত! তাহা হইলে এখনি সে আকুল আগ্রহে ঐ গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিত; তাহার পর যখন সে শুচিস্মিতা হইয়া নির্ম্মল হৃদয়খানি লইয়া দিব্যদেহে উঠিয়া আসিত তখন হয়ত তাহার এই নিদারুণ মর্ম্মজ্বালা আর থাকিত না, হয়ত শান্তির শুভ্রকরস্পর্শে বেদনার শেষ রেখাটুকুও ধুইয়া মুছিয়া যাইত, হয়ত তাহার সারাজীবনটা আবার পূর্ব্বের মত রঙিন স্বপ্নে বিভোর হইয়া উঠিত!

ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে তাহার অশ্রু আসিয়া পড়িত এবং যাহা গিয়াছে তাহা যে আর ফিরিবার নয় সেই কথাটাই বারম্বার ঘুরিয়া আসিয়া তাহার কল্পনার অবাস্তবতা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়া যাইত। এইরূপে আশার শেষ ক্ষীণরশ্মিটুকুও যখন আর অবশিষ্ট থাকিত না তখন কাহার যেন দরদমাখা কচি কচি দুইখানি হাত তাহাকে টানিয়া আনিয়া

বড় আদর করিয়া বেদনার সিংহাসনে বসাইয়া দিত; আর সে যেন কোমল কুসুম-কোরক-স্পর্শে মুহুর্মুহুঃ কণ্টকিত হইয়া উঠিত; সেই সঙ্গে সভয়ে সে তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে চাহিয়া দেখিত, সেখানে কাহার যেন তীব্রকামলোলুপ একখানা মুখ ফুটিয়া উঠিয়াছে; আচম্বিতে পথিপার্শ্বে উদ্যতফণা বিষধর দেখিলে পথিক যেমন সেদিক হইতে সহসা দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারে না, বিস্মিত, মুগ্ধ, ভীত হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া থাকে, ইন্দুও সেইরূপ গুণ্ডাসর্দ্দার আলীর অন্তর্দৃষ্টি সেই মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও সে চক্ষু ফিরাইয়া লইতে পারিত না।

কাশীতে আসিবার দিন হইতে কয়েক মাস যাবৎ অমূল্য ইন্দুর গৃহে আদৌ পদার্পন করে নাই। এখানে আসিয়া ইন্দু যে গর্ভবতী, তাহার গর্ভে যে ম্লেচ্ছের ঔরষজাত সন্তান বিদ্যমান, ইহা জানিতে পারিয়া সে আর ইন্দুর সম্মুখীন্ হইবে কি, ইন্দুর নাম স্মরণ করিতেও শিহরিয়া উঠিত। তাহাকে অন্তঃসত্বা জানিতে পারিয়া অমূল্যর হৃদয়ে যে হুতাশন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল আজ পর্য্যন্ত সে তাহা কোনরূপেই প্রশমিত করিতে পারে নাই।

এ বাটীতে গৃহের সকল কর্ম্মই দাসদাসীগণ করিত। অমূল্য শুধু নামমাত্র দেখাশুনা করিয়া সকাল সন্ধ্যায় দশাশ্বমেধ ঘাট বা মণিকর্ণিকায় বহুক্ষণ একাকী অন্যমনস্কভাবে বসিয়া থাকিত; বসিয়া বসিয়া জীবনের কত কথাই তাহার মনে পড়িত! বাল্যের কথা, কৈশোরের কথা, স্কুলজীবনের কথা, কলেজের কথা, মেসজীবনের কথা। শৈশব হইতে সে যেন কি এক অমূল্য রত্নের সন্ধানে জীবনের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল; সংসারের দুঃখদৈন্য, নিজেদের হীনাবস্থা, কোনও কিছুই সে লক্ষ্য করে নাই; সে যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত কি একটা

অজানা ভবিষ্যৎ আনন্দের মোহে আত্মহারা হইয়া ছুটিয়াছিল। সহসা সে স্বপ্ন তাহার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; জীবনের সে বর্ণবৈচিত্র্য আজ তাহার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সে মরে নাই বলিয়াই বাঁচিয়া আছে; বাঁচিয়া আছে বলিয়াই চলিয়া ফিরিয়া কার্য্য করিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু সমস্তই তাহার নিকট আজ উদ্দেশ্যশূন্য, নিরর্থক।

কলিকাতা হইতে সংবাদ আসিয়াছিল, সে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

ইহাতে তাহার আনন্দ হয় নাই সত্য, কিন্তু দুঃখও অনুভব করে নাই। একখানা পত্রে সুধীর লিখিয়াছিল—পরশ-পাথর পেয়ে যেন হারিও না অমূল্য, তা'হলে জীবনে আক্ষেপ রাখবার আর জায়গা খুঁজে পাবে না।

সেই কথাটাই আজকাল তাহাকে বড় বিব্রত করিয়া তোলে। বাল্যকাল হইতে নিজের অজ্ঞাতসারে সে বোধ হয় সত্যই ঐ পরশপাথর নিরন্তর হাতের কাছেই লাভ করিয়াছে। কিন্তু যেদিন যে-মুহূর্ত্তে সে তাহাকে মুষ্টির মধ্যে লইতে গিয়াছে সেই সময় হইতেই সে যেন অমূল্যর নিকট হইতে দূর হইতে দূরতর প্রদেশে সরিয়া গিয়াছে।

কখনও তাহার মনে হয়, ইন্দুর ভালবাসা সে বুঝি কখনও পায় নাই, পাইলে এমন হইত না; কখনও মনে হয়, সে তাহা পাইয়াছিল কিন্তু কখনও গ্রহণ করিয়া সে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই। এই ইন্দু তো একদিন তাহাকে "আমায় রাখ্‌তে পার্‌লে না অমূল্য-দা" বলিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে কলিকাতা হইতে চলিয়া গিয়াছিল। তখন সাহস করিয়া সে তো তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই? সে তো তখন ছুটিয়া গিয়া বলিতে পারে নাই—ইন্দু, তোমাকে আমি যেতে দিতে পার্‌ব না, তোমাকে প্রত্যাখ্যান

করবার মত সাধ্য আমার নাই? তবে? আজ তাহার সর্ব্বনাশের জন্য সে নিজে ভিন্ন অন্যে কে দায়ী হইবে?

কাশীতে আসিয়া ইন্দু অসুস্থ হইয়া পড়িতে অমূল্য তাহার যথোচিত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিল; ডাক্তার ডাকিয়া আনিল, ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিল। কিন্তু ইন্দুর সহিত কোনও কথা কহিল না।

রীতিমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু ইন্দুর অসুখ প্রশমিত হওয়া দূরে থাকুক্ ক্রমেই তাহা বৃদ্ধির পথে যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দেহখানি তাহার অতিরিক্ত শীর্ণ হইয়া পড়িল, অবশেষে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে দিনরাতের মধ্যে জ্বর আর বড় বিরামই হয় না। রক্তশূন্যতা ঘটিয়া শরীরের স্থানে স্থানে ফুলিতে আরম্ভ হইল।

এইরূপ অবস্থায় প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অমূল্য প্রাতে ও সন্ধ্যায় ইন্দুর কক্ষে গিয়া মৌনগাম্ভীর্য্যের সহিত নূতন আনীত ঔষধের শিশিগুলি টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিয়া দাসীকে সেবনের বিধিনিষেধ বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

এই সময় অমূল্য এক নিদারুণ দুঃসংবাদ পাইল। শঙ্করের মৃত্যু হইয়াছে; শোকসন্তপ্তা বিধবার যথোচিত তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহার পিতা দিগ্‌গজপুরে গিয়াছেন।

পত্র পাঠ করিয়া অমূল্য বহুক্ষণ পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, যেন বহুসমৃদ্ধিশালী একটা জনসঙ্কুল দেশ দুঃসহ ভূমিকম্পে ধীরে ধীরে এক মহান্ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইতেছে; তাহাকে রক্ষা করিবার কোন উপায়ই আর মানুষের হস্তে নাই।

সন্ধ্যা সমাগম হইয়াছে দেখিয়া কোঁচার খুঁট দিয়া দুইচক্ষু মুছিয়া চিকিৎসকের উপদেশানুসারে ঔষধের ব্যবস্থা করিবার জন্য অমূল্য ধীরে ধীরে ইন্দুর কক্ষে প্রবেশ করিল।

তাহার পদশব্দে চমকিতা হইয়া ইন্দু চক্ষু মেলিয়া চাহিল। অমূল্য দেখিল, ইন্দুর অশ্রুসিক্ত পাণ্ডুর মুখে কি যেন একটা অসহায় আতঙ্কের ভাব সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দুর এই সকরুণ মুখচ্ছবি নয়নে পড়িতেই তাহার বুকের ভিতরটা কেমন হু হু করিয়া উঠিল। কর্ণে যেন সে কাহাদের তীব্র হাহাকার শুনিতে পাইল। শুনিয়া সহসা তাহার বুকের ভিতরটা যেন অসহ বেদনায় টন্‌টন্ করিতে লাগিল। আজ যেন তাহার দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দু কোনও বাঁধা না মানিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে চাহিল—ওগো ইন্দু ভয় কি? আমি আছি। ভয় কি?

কিন্তু তাহার আজীবনের সংস্কার সজোরে তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল। তাহার প্রাণের ক্রন্দন সে আর ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিল না। কতকগুলা ভীষণদর্শন প্রতিহিংসালোলুপ দৈত্য কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া রোষকষায়িতলোচনে অমূল্যর মুখে সজোরে চপেটাঘাত করিয়া তীক্ষ্ণ শ্লেষের সহিত প্রশ্ন করিল—মূর্খ, ইন্দুর গর্ভস্থ সন্তান কাহার ঔরষজাত? কুলটা ইন্দু তোর কে?

অমূল্য অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া ইন্দুর ঔষধের শিশিগুলি টেবিলের উপর যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিল; পরে একদাগ ঔষধ ঢালিয়া সে ইন্দুর নিকট গিয়া দাঁড়াইল। ইন্দু মুখ ঘুরাইয়া লইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর অমূল্য কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল—ইন্দু!

আজ বহুদিন পরে অমূল্যর মুখে আপনার নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া ইন্দু তাহার সকরুণ ব্যথিত দৃষ্টি লইয়া অমূল্যর প্রতি চাহিল। তাহার সেই মর্ম্মভেদী দৃষ্টির সম্মুখে অমূল্য আপনাকে আর কিছুতেই স্থির রাখিতে পারিল না; ঝর্ ঝর্ করিয়া তাহার দুইচক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

ইহা দেখিয়া ইন্দুর চক্ষু দুইটিও অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল; সে দরদমাখান স্বরে বলিল—কাঁদো কেন ?

অমূল্য বলিল—শত চেষ্টাতেও আর যে তোমায় ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌ছি না ইন্দু ?

অমূল্যর মুখের "তোমায়" শব্দটী যে সম্ভ্রমের দূরত্ব নির্দ্দেশ করিল তাহা উপলব্ধি করিয়া ইন্দুর মুখে একটু ম্লানহাসির ছায়া পড়িল; সে বলিল—তা'তে কি হবে ?

অমূল্য বলিল—কি হ'বে তা হয়ত বলা কঠিন। হয়ত আত্মতৃপ্তির জন্যেই সেটা দরকার, হয়ত বেঁচে থাকবার জন্যেও সেটা না হ'লে চল্‌বে না।

ইন্দু অনেকখানি আপনমনেই বলিল—তাইতো মনে হয়েছিল; কিন্তু এখনতো দেখ্‌ছি তাও সত্যি নয় ? বেঁচে তো থাকা যায় !

অমূল্য বলিয়া উঠিল—এ কেমন বেঁচে থাকা ইন্দু ? এমন করে কি বেঁচে থাকা যায় ? যখন হারায়নি তখন কি ছিল জান্‌তেও পারিনি; আজ যখন হারিয়ে বসে আছি তখন মনে হচ্ছে যা ছিল তা ছেড়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব।

সহসা অমূল্যর ভাবান্তর ঘটিল। সে বলিল—আচ্ছা ইন্দু, সত্যিই কি ক্ষমা করা যায় না ?

ইন্দু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কা'কে ?

পরে ধীরে ধীরে সে কহিল—তোমার কথা যদি হয়, তা'হলে তোমাকে কিসের ক্ষমা তা'তো বুঝিনা ? আর আমার কথা যদি বল, তবে আমি তা কি করে বল্‌বো ? সে তো আমার চেয়ে তুমিই বেশী জান ?

শেষের কথা কয়টী বলিতে গিয়া ইন্দুর মুখে ম্লান হাস্যের রেখা ফুটিয়া উঠিল।

অমূল্য হটাৎ ইন্দুর রোগশীর্ণ হাতদুইখানি আপন হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—সত্যি করে বল দেখি ইন্দু, তা তুমি বল্‌তে পারো কিনা ?

ইন্দু কাতর কণ্ঠে বলিল—না গো না। আজ তুমি আমায় ক্ষমা কর্‌লেও আমি নিজেকে যে আর ক্ষমা করতে পার্‌ছি না !

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল—কেন ?

—আমি যে মহাপাপী ; তাই আগেকার মত আমি তোমায় আর সমস্ত মনটা দিয়ে চাইতে পার্‌ছি না। ইচ্ছে কর্‌লেও নয়।

শুনিয়া অমূল্য ধীরে ধীরে ইন্দুর হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া বলিল—কিন্তু আমি যদি তোমায় এই ভাবেই চাই ?

ইন্দু বলিল—তা'হলে এমন কোন প্রায়শ্চিত্তের নাম কর, যা কর্‌লে আমার মনের ভেতরের পাপও ধুয়ে যাবে ?

প্রায়শ্চিত্তের কথা শুনিয়া অমূল্যর মুখভাব কঠোর হইয়া উঠিল ; তাহার দৃষ্টি হইতে তীব্র নির্ম্মমতা ফাটিয়া পড়িতে লাগিল ; হস্ত তাহার মুষ্টিবদ্ধ হইল।

কঠোর স্বরে সে বলিল—কর্‌ব। কিন্তু তুমি কি তা পারবে ইন্দু ?

ইন্দু কহিল—পার্‌বো।

অমূল্যর কণ্ঠে প্রতিহিংসার সুর বাজিয়া উঠিল।

সে বলিল—তোমার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'বার সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্বহস্তে হত্যা কর্‌তে পার্‌বে ইন্দু ?

শুনিয়া ইন্দুর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। সে অমূল্যর ভীষণ মুখের প্রতি সভয়ে চাহিয়া রহিল।

শুধু মুখ হইতে তাহার অস্পষ্ট ভাবে বাহির হইল—না।

অমূল্য দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে লাগিল—না কেন ইন্দু ? তোমার অপমানকর

পিছনটাকে মুছে ফেলতে হলে এ ছাড়া আর অন্য উপায় নেই। তুমি আমাকে একদিন সর্ব্বান্তঃকরণে চেয়েছিলে। তোমাকে ছেড়ে আমিও বাঁচতে পারব না। অথচ তোমার আমার মাঝখানে আজ যে এই দুর্লঙ্ঘ্য আড়ালের সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পদদলিত না করলে যে, সে তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে? পারবে না? কেন পারবে না? দিবারাত্র আমি যে দুঃখ সহ্য করছি, যে জ্বালায় জ্বলেপুড়ে যাচ্ছি তা'র কাছে কি এ এত বড়? এত কষ্টকর? এতই দুঃসাধ্য?

অমূল্য দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া বলিয়াই চলিয়াছিল; মুহূর্ত্তের জন্য ইন্দুর মুখের প্রতি চাহিয়াও দেখে নাই; সে লক্ষ্য করে নাই, তাহার কণ্ঠস্বর উত্তরোত্তর যতই উচ্চে উঠিতেছিল ইন্দু ততই প্রাণভয়ে ভীতা হরিণীর ন্যায় তাহার নিকট হইতে সরিয়া যাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিল ও অবিরত অশ্রুজলের সহিত তারস্বরে কাতর প্রতিবাদ জানাইতেছিল—না—না—না—!

এক্ষণে ইন্দুর উপর দৃষ্টি পতিত হইতে অমূল্য চমকিয়া উঠিল। এ সে করিয়াছে কি? অমূল্য কি স্ত্রীহত্যা করিতে বসিয়াছে না কি? তাহার নির্ব্বোধ বাক্যের নির্ম্মম আঘাতে ইন্দু যে সংজ্ঞা হারাইয়া শয্যাতলে লুটাইতেছে? নয়নজলে তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত হইয়া যাইতেছে?

অবিলম্বে সে ইন্দুর মুখে শীতল জল সিঞ্চন করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে ইন্দু যখন সহজ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল অমূল্য তখন আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিল ইহাই ভাবিয়া যে, সে যদি পথের কাঁটার মত, চাঁদের কলঙ্কের মত, আলোর উত্তাপের মত ঐ আড়ালকে দ্বিধাশূন্য হইয়া সাদরে গ্রহণ করিতে না পারে তবে সে ইন্দুর কতখানি গ্রহণ করিতে

উদ্যত হইয়াছিল ? তাহাকে ক্ষমা করিয়া, ক্ষমা ভিক্ষা করিবার কতটুকু শক্তি হাতে লইয়া আজ সে ইন্দুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ? মূর্খ সে, কাপুরুষ সে, দুর্ব্বল সে ! এই জগতে কোনও কিছু দাবী করিবার যোগ্যতা তাহার নাই। সেই জন্য ফাঁকি দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে গিয়া জীবনে সে শুধু বঞ্চিত হইয়াই ফিরিতেছে।

৩৭

ইহার পর কয়েক দিবস না যাইতেই ইন্দুর জ্বর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চিকিৎসক আসিলেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ পরিবর্ত্তন করা হইল। কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। অমূল্য অক্লান্ত পরিশ্রমে রাত্রি জাগরণ করিয়া, রোগীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। ইন্দু যখন রোগের অসহ যন্ত্রনায় কাতর হইয়া পড়ে, অমূল্য তখন কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কখনও শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতে থাকে, কখনও মস্তকে হাত বুলায়, কখনও বা ওডিকলোন দিয়া কপোলদেশ মুছাইয়া দেয়। কিন্তু কোনওমতেই যাতনা নিবারণ করিতে না পারিয়া অবশেষে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে থাকে।

যে কোনও কারণেই হউক আজ অমূল্যর নিকট ইন্দুর জীবন এক মহামূল্য সামগ্রীবিশেষ। যে কোন উপায়েই হউক ইন্দুকে বাঁচাইয়া

তোলাই এখন তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইন্দু রোগমুক্ত হইয়া বাঁচিয়া উঠিলে তাহার যে কি লাভ তাহা সে জানে না, জানিতেও চাহে না। ইন্দু বাঁচিয়া উঠিলে ইন্দুর জীবন আবার সুখসূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, কি উত্তপ্ত সাহারার মধ্যাহ্নতাপে ঝলসিয়া যাইবে, সে কথা চিন্তা করিয়া দেখিবারও আর তাহার অবসর নাই। সে জানে, ইন্দুকে সুখী করিতে এজগতে একমাত্র যদি কেহ পারিত, তবে সে নিজেই। আজ যে এই নিরপরাধিনী বালিকা দুঃসহ মর্ম্মদাহ সহ্য করিতে না পারিয়া আপনাকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা শুধু তাহারই কৃত কর্ম্মের ফল।

একদিন রাত্রে জ্বরের ঘোরে অমূল্যর হাতদুইখানি ধরিয়া স্নেহবিগলিত কণ্ঠে ইন্দু বলিল—হ্যাঁগো, তুমি ইন্দুকে চেন? শঙ্কর মুখুর্জ্জের মেয়ে, অমূল্যদা'র সঙ্গে খেলা করতো, দিগ্‌গজপুরে বাড়ি? চেন না? মেয়েটা ভারি দুষ্টু, না? গুণ্ডাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল কি না? আলী দেখ্‌তে বেশ! না? কিন্তু কি দুর্দ্দান্ত—

বলিতে বলিতে সে 'বাবা—বাবা' বলিয়া শিশুর ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

শুনিতে শুনিতে অমূল্য আপন ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল; কিন্তু ইন্দুর এই প্রাণস্পর্শী আকুল ক্রন্দনে সে আর স্থির থাকিতেও পারিল না; তাহার মনে হইল, বুঝিবা পরম স্নেহাস্পদের অশুভ সংবাদ আত্মা বাহ্যতঃ গোপন করিলেও তাহা মানুষের কি এক অজানিত, অনাবিষ্কৃত, রহস্যময় উপায়ে আত্মজনের হৃদয়দ্বারে গিয়া নিশ্চিতভাবেই পৌঁছায়।

অমূল্যর চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

ইন্দু আবার বলিতে লাগিল—মেয়েটা দু'জন। জানো? একজন নষ্ট। সে মেলচ্ছের ভাত খেয়েছে, তাদের ঘর করেছে।

ইন্দুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে জ্বরের ঘোরে শয্যা হইতে উঠিবার উদ্যম করিয়া কোনও অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে, "কালামুখী, দূর্! দূর্!" বলিয়া তীব্র তিরস্কার করিতে লাগিল।

অমূল্য জোর করিয়া ইন্দুকে শোয়াইয়া দিল। কিছুক্ষণ সে শান্তভাবে শুইয়া রহিল।

পরে আবার বলিতে লাগিল—কিন্তু অন্য মেয়েটা বড় ভাল। না গো? তা'র বড় দুখ্যু। তাকে কিছু বল না। বাপের অবস্থা দেখে সে কত কাঁদ্‌লে। অমূল্যদা'র জন্যে সে কত কাঁদে। পেটের ছেলেটার জন্যে সে কত কাঁদে। বোঝালে বোঝেনা। ভারি দুষ্টু। আমি বলি, কাঁদিস্ কেন? তোর কোলে যখন টুক্‌টুকে একটি ছেলে তুলে দোব তখন তার মুখের দিকে চেয়ে তোর সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। ওরা আবার বলে কি জান? বলে মেরে ফেল্‌বে—!

ইন্দুর ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল।

অমূল্যর আজ যেন এতদিন পরে স্পষ্ট মনে হইল, হিন্দুসমাজের তলে তলে বহুদিন হইতে একটা ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়া আজ তাহা বহুদূর বিস্তৃত হইয়া এতখানি বৃহদায়তন হইয়াছে যে, সমগ্র হিন্দুসমাজটাই বুঝি এইবার তাহার গর্ভে ডুবিয়া যায়! এই ফাঁক্‌টা এতদিন কেমন করিয়া তাহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। এতদিন তাহারা শুধু সতীত্বের অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যের গুণগান করিয়া, শিখা ও উপবীতের ভিত্তির উপর সমাজের গণ্ডী বাঁধিয়া, জীবের মুক্তির সহজ পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছিল। বাস্তব জীবনের কঠোর সত্যের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে নাই। আজ যখন সর্ব্বনাশ মুখব্যাদান করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, অসংখ্য জীবন শোণিতপিপাসু খড়্গের তলে আসিয়া অবশ্যম্ভাবী আঘাতের অপেক্ষা করিতেছে, তখন

তাহাদের নিদ্রা ভাঙ্গিবার সময় উপস্থিত হইল। তীর যখন জ্যামুক্ত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, তখন তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার কথা স্মরণ হইল!

অমূল্য আজ তাহার আশৈশব শিক্ষার উপর বিজাতীয় ঘৃণা অনুভব করিল। তাহার মনে হইল, হিন্দু হইয়া জন্মিয়াছে বলিয়া আজ তাহার গৌরব করিবার কিছুই নাই। সে যদি হিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ না করিত তাহা হইলে আজ হয়তো সে চেষ্টা করিলে ইন্দুকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতে পারিত; এবং ইন্দুরও বিবেকবুদ্ধি সত্যভ্রষ্ট হইয়া আজ অভাগীকে এই শোচনীয় পরিণামের দিকে টানিয়া আনিত না।

হিন্দুসমাজে জন্মলাভ করিয়া তাহার হইয়াছে কি? একজন শ্বেতাঙ্গের হৃদয়েও যেটুকু উদারতা আছে, অমূল্যর তাহাও নাই। হিন্দুর বেদ, হিন্দুর উপনিষদ্, হিন্দুর ষড়্দর্শন, হিন্দুর অষ্টাদশ পুরাণ, হিন্দুর স্মৃতি, হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর প্রাচীন আদর্শ, হিন্দুর ভাস্কর্য্য প্রভৃতির দোহাই দিয়া আজ যে বর্ত্তমান হিন্দসমাজকে জগতের সম্মুখে সগৌরবে উচ্চে তুলিয়া ধরিবার হাস্যকর চেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে সমাজের দৌর্ব্বল্য, সঙ্কীর্ণতা, দাম্ভিকতা, মনুষ্যত্বহীনতা কতখানি প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে তাহা চিন্তা করিতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। ধর্ম্ম যে সমাজ নয়, ধর্ম্ম যে মুষ্টিগত কয়েকটী ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের অভিব্যঞ্জনা নয়, সে যে বিশ্বব্যাপী মানবমাত্রেরই কল্যাণের অগ্রদূত, আসল মানুষটাকে তরজমার বাহিরে রাখিলে ধর্ম্মের হিসাব যে ফুৎকারে উড়িয়া যায়, অথচ, সমাজের প্রাণই যে ধর্ম্ম, এই সহজ কথাটা আজ কোনও হিন্দুই যখন বুঝিতে চাহিল না, তখন এইরূপ কত শত ইন্দু যে আজ বিনাপরাধে অদৃষ্টের লাঞ্ছনা অহরহঃ নির্ব্বাক্ হইয়া সহ্য করিবে, তাহার মত কত শত অমূল্য যে প্রাণের যাতনায় অহর্নিশ এই সমাজকে অভিশাপ দিতে

দিতে মরণকে সাদরে আহ্বান করিবে, তাহা এই জগতের যিনি মালিক তিঁনি ভিন্ন আর অপর কে জানিবে ?

মধ্যাহ্ন হইতে ইন্দু ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল। চিকিৎসক আসিয়া নূতন ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু কোনও আশা দিতে পারিলেন না; বরং আত্মীয়স্বজনকে সত্বর সংবাদ প্রেরণ করিবারই উপদেশ দিলেন।

অমূল্য ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় টেলিগ্রাম করিল। চিকিৎসক বলিয়া গিয়াছিলেন, সহজে প্রসব না হইলে অস্ত্রোপচারের আবশ্যক হইতে পারে। অমূল্য ভীতান্তঃকরণে আকুল উদ্বেগের সহিত সারারাত্রি যে কিরূপে অতিবাহিত করিল তাহা সে নিজেও জানিতে পারিল না।

পরদিন প্রাতে ইন্দুর জননীকে অন্নপূর্ণার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া নরেন্দ্রনারায়ণ বাবু, হারাণ ও বিদ্যুৎকে সঙ্গে লইয়া কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাটীতে প্রবেশ করিতেই তিঁনি শুনিলেন, ইন্দু সদ্যঃ দুইটী যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছে। একটী হইয়াছে কন্যা, অপরটী পুত্র।

অনেকখানি আশ্বস্ত হইয়া তিঁনি উপরে উঠিতেই দেখিলেন, অমূল্য অস্থিরচিত্তে স্থান-কাল-পাত্র একরূপ বিস্মৃত হইয়া বারান্দায় ঘন ঘন পায়চারী করিতেছে। এমন কি তাহাদের উপস্থিতিও সে আদৌ বুঝিতে পারিল না।

নরেন্দ্র বাবু কোমল স্বরে ডাকিলেন—অমূল্য।

অমূল্য চমকিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল। নরেন্দ্রবাবুকে কি হারাণকে প্রণাম করিবার কথাটাও তাহার স্মরণ হইল না।

নরেন্দ্রবাবু ইন্দুর কক্ষ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন কি রকম ?

বিকৃতকণ্ঠে অমূল্য বলিল—কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

বিদ্যুৎ ইতিমধ্যে কখন ইন্দুর কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। এক্ষণে চিকিৎসকের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইঙ্গিতে সে নরেন্দ্রবাবুকে অন্তরালে আসিতে অনুরোধ করিল।

নরেন্দ্রবাবু চিকিৎসককে লইয়া যখন পুনরায় অমূল্যর নিকট ফিরিয়া আসিলেন তখন অমূল্য চিকিৎসকের প্রতি জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া দেখিল।

তিনি বলিলেন—রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে যাচ্ছে। এখনি চার সিরাম্ ব্লড্ পেলে একবার ইন্‌জেক্ট্ করে দেখ্‌তে পারি।

অমূল্য তৎক্ষণাৎ বলিল—তবে বিলম্ব কর্‌ছেন কেন?

চিকিৎসক কহিলেন—দেবে কে?

অমূল্য বলিল—কেন? আমি?

"তবে শীঘ্র আসুন্" বলিয়া তিনি অমূল্যকে সঙ্গে লইয়া পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। নরেন্দ্র বাবু ও হারাণ তাহাদের অনুসরণ করিলেন। বিদ্যুৎও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

ইন্দু বহুক্ষণ নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল। অমূল্যর দেহ হইতে শোণিত লইয়া দুই দুইবার তাহাকে ইন্‌জেক্‌সন্ করা হইল। কিন্তু তাহার কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটিল না। ইন্দু সেই যে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিল, আর নয়ন মেলিয়া চাহিল না। ক্রমেই তাহার নিদ্রা গাঢ়তর হইতে লাগিল।

বড় পরিশ্রান্ত সে। মানুষের ব্যবহারে, সমাজের অত্যাচারে, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে সে বহুদিন হইতে জর্জ্জরিত। বহুকাল পরে আজ সে অবসর লাভ করিয়াছে। আর সে জাগিবে কেন?

নিরপরাধিনী বালিকা জানে না, এ জগতে সে কাহার পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করিতে আসিয়াছিল! কিন্তু দেহ যে তাহার আর চলে না, মন যে তাহার আজ বড় অবসন্ন! তাই আজ সে নিদ্রার ক্রোড়ে আত্মসমর্পন করিয়াছে। আর সে জাগিবে কেন?

তাহার বহু আকাঙ্খিত বিশ্রাম আজ তাহাকে আলিঙ্গন করিতে হস্ত প্রসারণ করিয়াছে। আর সে জাগিবে কেন?

চিকিৎসক উদ্বিগ্নচিত্তে মুহুর্মুহুঃ নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সহসা ইন্দুর মস্তক বামপার্শ্বে ঢলিয়া পড়িল।

অমূল্য ছুটিয়া গিয়া ইন্দুকে বক্ষের মধ্যে লইয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—এ আমায় কি শিক্ষা দিয়ে গেলে ইন্দু? এ আমায় কি শিক্ষা দিয়ে গেলে?

উপস্থিত সকলেরই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ পরে নরেন্দ্র বাবু অশ্রুমোচন করিয়া অমূল্যকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। আপন ওষ্ঠ দংশন করিয়া অমূল্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, সম্মুখে সদ্যঃ প্রস্ফুটীত কুসুমতুল্য নিদ্রামগ্ন দুইটী শিশু। দেখিয়া সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না; অসহায় বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—এখন এদের উপায় কি হবে?

ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ অগ্রসর হইয়া শিশু দুইটীকে ক্রোড়ে লইয়া বসিল। নরেন্দ্রবাবুর মুখ হর্ষোজ্জ্বল হইয়া উঠিল;

তিঁনি বলিলেন—ওই দুটী প্রশ্নের মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত কেউ করতে পারেনি। তুই কি পারবি মা?

বিদ্যুৎ পিতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে কহিল—আশীর্ব্বাদ করুন্ বাবা।

নরেন্দ্রবাবু বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কি বলিলেন ঠিক বুঝা গেল না। হারাণ ও অমূল্য মূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রচ্ছদপটখানির শিল্পী শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত

বিশ্বনাথবাবুর—

১। চিন্তাধারা

মূল্য—২৲

২ সন্ধান

উপন্যাস

(যন্ত্রস্থ)

গ্রন্থকারের 'চিন্তাধারা' সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার, এম-এ, পি-এইচ্-ডি, মহাশয় লিখিয়াছেন :—

জীবনের তত্ত্বকথাগুলি দর্শনের পরিভাষা বাদ দিয়া প্রাণস্তরের ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা গ্রন্থকারের অতি সুন্দর আছে। এ দেশে এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচারের আবশ্যকতা আছে—সাধারণ লোকের নিকট ইহা পরিবেশন করিবে আনন্দ ও চিন্তা—অথচ চিন্তা করিতে যে পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা করিতে হইবে না—মানুষের সব চিন্তাই জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে 'ভরে' থাকে—যে গ্রন্থকার সেই গ্রন্থিগুলিকে উন্মোচন করিতে পারেন, তিনি মানুষের তর্কবুদ্ধির অগোচরে তর্কপ্রতিষ্ঠিত সত্যগুলিকে উপস্থিত করেন। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের এই ক্ষমতা পূর্ণরূপে আছে দেখিয়া খুব আনন্দ লাভ করিলাম। বাঙ্গলা ভাষায় দার্শনিক প্রবন্ধ বহুল প্রচার থাকিলেও, এরূপ প্রচেষ্টা এই প্রথম। দর্শনের তত্ত্বগুলি যখন এইরূপ ভাষায় প্রকাশিত হয় তখন তাহার সত্যগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে—দর্শনের ও কবিত্বের ভিতর আছে যে একটা চিরন্তন ভেদ তাহার লোপ হইয়া যায়।

এড্ভান্স্ বলেন :—

In this book of philosophical reflection, neither the theory of Cosmic Evolution nor the abstruse Vedantic

discussion shall blur the vision of the reader. The author has tried to approach that eternal truth in a very simple manner without introducing philosophical technicalities. In this treatise he confesses his inability to absorb in him that eternal beautitude. Art is progressing, Science is branching out, the cultural history of mankind is increasing in size and bulk, but helpless man is standing where he stood centuries ago. Nature—cruel and pathetic, sad and solemn, bright and beautiful, grave and sombre has effectively guarded the gate of the storehouse of mysticism. It is at this gate that the poetic philosopher is waiting and imploring to have the door opened, so that the real peace, truth in its real form and beautitude in its real aspect may be the heritage of mankind. The auther is to be congratulated on producing such an enjoyable work.

* * *

শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট্, মহাশয় লিখিয়াছেন :—

বইখানি নানান দিক দিয়া একটু স্বতন্ত্র ধরণের। * * প্রাত্যহিক জীবনের ঝড় ঝঞ্ঝায়, আশা-আকাঙ্ক্ষায়, সুখ-দুঃখে, উৎসাহ-নৈরাশ্যে প্রতিহত অথবা উদ্বুদ্ধ হইয়া একটি সচেতন ও স্পর্শকাতর, উদার ও অন্তর্মুখী মন কি ভাবে এই প্রতিঘাত বা উদ্বোধনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে এই পুস্তকে তাহার একটী সুন্দর আলেখ্য পাওয়া যাইবে। * * * লেখকের ভাষাটী আমার কাছে অতি সুন্দর লাগিয়াছে। এমন রুচিস্মিত ক্ষিপ্রগতি প্রাঞ্জল সাধুভাষা

বহুকাল বাঙ্গালায় পড়ি নাই। * * * বইখানি বাঙ্গালা ভাষায় নূতন ধরণের, ইহাতে যেন একটা নূতন সুর বাজিতেছে, এবং যাহারা নিভৃত ভাবে সচ্চিন্তায় বা মানসিক অবলোকনে অভ্যস্ত, তাঁহারা মানসিক রসায়ন ইহা হইতে কিছু না কিছু পাইবেনই।

*　　　*　　　*

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন :—

Since the dawn of civilization philosophers and poets have been endeavouring to penetrate into the sanctuary of Nature, but Nature resolutely shuts her doors to man. The author of the present book has a philosophical outlook on life and is seized with an intense yearning to grasp the truth lying behind the outward phenomena of nature. He feels that one can not find real happiness except by merging one's own identity in that of Nature. It is a remarkable feature of the book that it is entirely free from philosophical technicalities which very often stand in the way of the proper enjoyment of a book of this nature. The author is thoughtful and seems to have an intelligent grasp of the realities of life. We welcome him in the field of Bengali literature and feel confident he will really enrich our literature by such contributions.

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩২, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় বি-এ, কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, ১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।